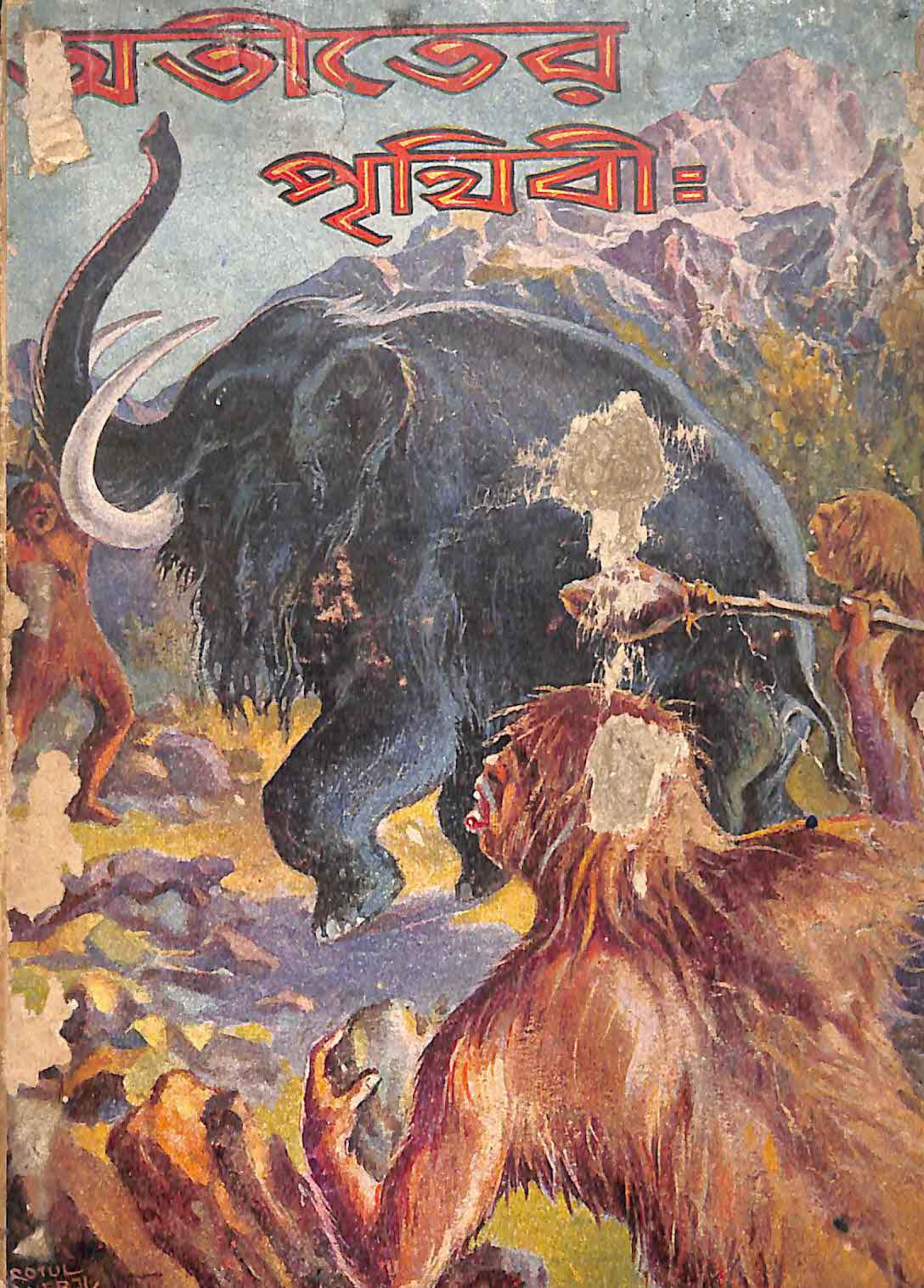
অতীতের পৃথিবীঃ







শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত,
কলিকাতা গেজেট ৭ই মে ১৯৪০, নূতন সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৬১



ব্ল্যাক অ্যারো, তাতারের বন্দী, দেশ বিদেশের হীরে জহরৎ,
ঝিলে জঙ্গলে প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মহালয়া
১৩৬৮
২

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
দেড় টাকা



উপহার

দুই একটি কথা

এই গ্রন্থে গল্পের মধ্য দিয়ে সৌরজগৎ ও পৃথিবীর জন্মবিবরণ, তারপর থেকে তার ক্রমবিকাশ, সেই সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে মানুষ, নানাপ্রাণী ও উদ্ভিদের উৎপত্তি এবং লয় সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। গ্রন্থখানি ছেলেদের জন্য লিখিত। সেজন্য ভাষাকে সহজ, সরল ও বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক করবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। লিখবার সময় সর্ব্বদা সতর্ক থেকেছি যে, ছেলেরা গ্রন্থখানির দু ছত্র পাঠ করেই নীরস বলে সরিয়ে না রাখে। গ্রন্থখানি যদি আমার পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগে এবং তাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে, তাহলে আমার শ্রম ও প্রকাশক মহাশয়ের ব্যয় সার্থক হবে।

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০

গ্রন্থকার

অতীতের পৃথিবী

প্রথম অধ্যায়

সৌরজগতের জন্ম

ঠাকুরদা নাতি-নাতনীদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। তিনি চমৎকার গল্প জানেন। কত দেশ যে তিনি বেড়িয়েছেন, কত কি যে দেখেছেন তার হিসেব নেই। নাতি-নাতনীরা রোজ সে-সবের গল্প শোনে; আজও শুনবে। কিন্তু তারা কেউ তাঁর নিজের নাতি-নাতনী নয়, পাতানো।

বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে গিয়ে সকলে উপস্থিত।

সামনে খরস্রোতা নদী—দু'পাশে ঘন শালবন। তাহার মধ্য দিয়ে হাওয়া বয়ে চলেছে। জনকয়েক সাঁওতাল তীর-ধনুক নিয়ে সারবেঁধে যাচ্ছিল। তাদের শরীরে যেমন স্বাস্থ্য, মনেও তেমনি স্ফূর্তি। ওপারে সূর্য্য ডুবছে টকটকে লাল।

চারধারে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। ঠাকুরদা বল্‌লেন—"চল, সব পাথরের ওপর উঠে বসা যাক্—"

পাথরগুলো খুব কাছাকাছি পড়ে ছিল। সকলে উঠে বস্‌ল।

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"আজ তোদের এমন এক দেশের গল্প বল্‌ব, যা এই পৃথিবীতেই ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। তখন যে-সব প্রাণী ছিল, যে গাছ-পালা সামনের ঐ শালবনের চেয়েও ঘন ও দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল, তাদের কারুকেই আজ পৃথিবীর কোন বনেই খুঁজে পাবি না; তারা প্রায় সকলেই লোপ পেয়েছে। তবে তাদের কারো কারো বংশধরকে এখানে-ওখানে আজও দেখ্‌তে পাবি। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষদের চেহারার সঙ্গে এদের বিশেষ মিল নেই। কেননা, সে সব তো দশ হাজার, বিশ হাজার বছর আগের গল্প নয়; তাদের পর কোটি কোটি বছর কেটে গেছে। জলবাতাসের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে!

তোরা দেখেছিস্ পশু-পাখী ও গাছ-পালা জন্মে, বাড়ে, বুড়ো হয়, শেষে একদিন মরে যায়। আমাদের এই পৃথিবীটাও একদিন ওদেরই মত জন্মেছে। কারো পেট থেকে, কোন বীজ থেকে বা কোন এক জায়গার মাটিতে নয়। তাকিয়ে দেখ্, মাথার ওপর নীল আকাশ। পশ্চিমে শালবনের মাথায় সূর্য্য ডুবছে। কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকার নাম্‌বে। সেই সঙ্গে আকাশখানা তারায় তারায় ছেয়ে যাবে।

কত রকমের, কত রঙের তারা! কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটা তার চেয়েও ছোট, কোনটাকে দেখা যায় কি না যায়! সব-গুলো জ্বল্‌ছে—ওদের লাল, হল্‌দে, সাদা ও সব্‌জে আলো দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দৃশ্যটিতে মনে হয় কত রহস্যই না ওদের মধ্যে লুকানো!

সবগুলোর আলো ঘন ঘন কাঁপছে। কিন্তু এদের মধ্যে এক একটাকে দেখা যায় স্থির, শান্ত, তার আলোক একটুও কাঁপে না—

যেন পলকহীন চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে! যেমন সাঁঝের তারাটি—"

খোকন বল্‌লে—"আর শুকতারাটি—"

"ঠিক ঠিক। বুড়ো হয়েছি—তাই শুক তারাটির কথা মনে ছিল না। কিন্তু ভাই, ওরা দুটো নয় একটা তারা। উনি হলেন আমাদের শুক্রগ্রহ—কখনও ভোরে দেখা দেন শুকতারা হয়ে, কখন সন্ধ্যায় উদয় হন সন্ধ্যা-তারা হয়ে।

এই তারার মেলায় লক্ষ্য করে দেখ্, এখানে-ওখানে একটু একটু উজ্জল মেঘ। এই সবের ওপর দিয়ে হঠাৎ আকাশ আলোকিত করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে।

এ সব তোরা খালি চোখে দেখ্‌তে পাবি।

কিন্তু খুব বড় দূরবীণ দিয়ে দেখ্‌লে, দৃশ্যটা একেবারে বদলে যাবে। যে-তারাগুলোকে দেখা-যায়-কি-না-যায়, যে-তারাগুলো জোনাকীর মতো পিট্ পিট্ করছে, সেগুলো হয়ে ওঠে স্পষ্ট। আবার এমন তারা আছে যাদের খালি চোখে দেখাই যায় না, সেগুলোও দেখা যাচ্ছে। আর, ঐ যে অস্পষ্ট ঈষৎ উজ্জল আকাশের চারধারে ছড়ানো মেঘের অংশগুলো, ওগুলোকে দেখা যাচ্ছে বড়ই বিচিত্র।

ওদের কোনটা স্প্রীংয়ের মতো ঘোরানো, কোনটা আংটির মতো। কোনটা যেন বায়ু বিক্ষিপ্ত মেঘ! ওদের প্রায় সবগুলোই উজ্জল গ্যাসরাশি। কিন্তু কোনটাই স্থির নয়, একটা লক্ষ্য ধরে অহরহ ছুটছে। এই গ্যাসরাশি আকাশের দু' মাইল, দশ মাইল বা হাজার মাইল জায়গা জুড়ে নেই—আছে লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে।

এই আকাশের কোথাও কিছু স্থির নেই। সব ছুটছে, জ্বলছে, ঘুরছে। এই চঞ্চলতায় কত নতুন সৃষ্টি হচ্ছে, কত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে! আমরা সে-সবের খবরও রাখি না। চিরকাল এমনি ঘটছে।

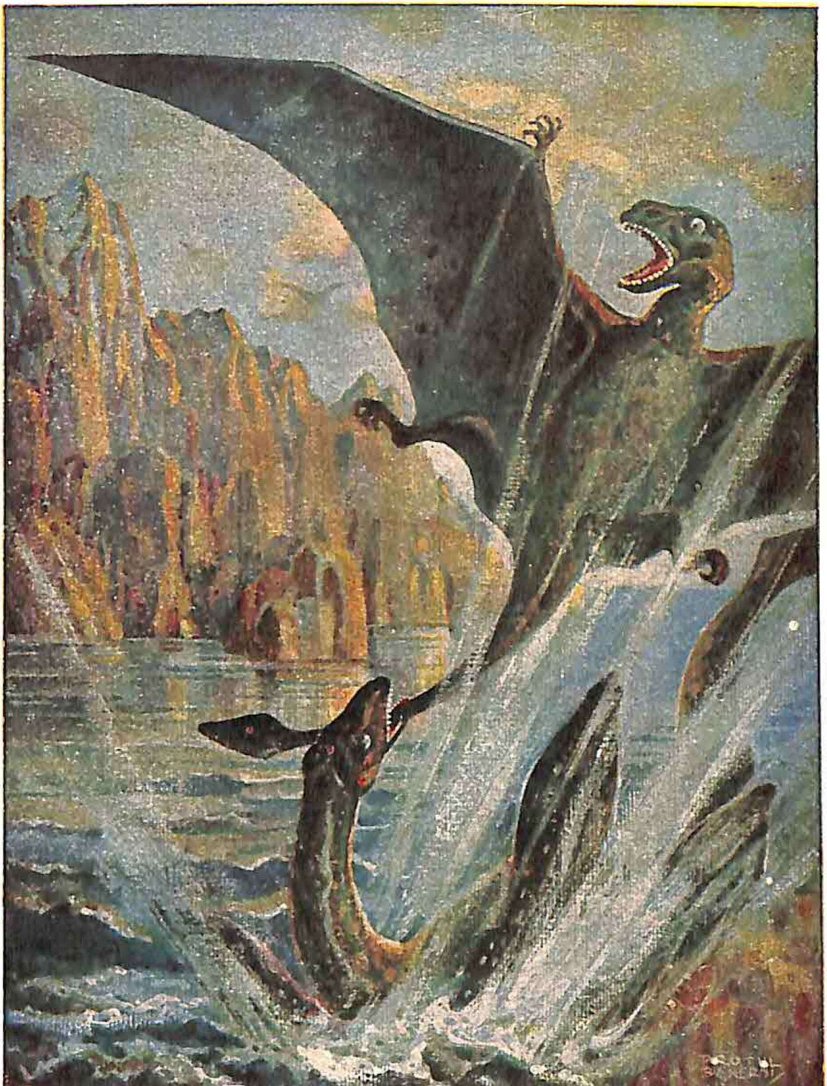
দূরের জিনিস ছোট দেখায়। ওগুলো আমাদের কাছ থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে আছে; তাই ওদের অত ছোট দেখি।

ঐ যে সব মেঘের টুক্‌রো, ওগুলোকে বলা হয় নীহারিকা। আমাদের এই সৌরজগৎ—সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি —আগে ছিল অমনি একটা নীহারিকায় মিলিয়ে। সেটা আকাশের তারার মেলায় কোটি কোটি মাইল জুড়ে জ্বলছিল ও ঘুরছিল। কি প্রচণ্ড ছিল তার তাপ ও বেগ!

কিন্তু ক্রমে সে তাপের আধিক্য কম্‌তে শুরু হল; আর, সেই সঙ্গে নীহারিকাটা জমে যেতে লাগল। অবশ্য এ কাণ্ড ঘটতে লেগেছিল কোটি কোটি বছর। তখন আমরা কেউ তো ছিলাম না।

নীহারিকাটা যত জমে, আয়তনে তত ছোট হয়ে আসে। শেষে একদিন একটা প্রকাণ্ড খণ্ড ঐ নীহারিকাটি থেকে ছিট্‌কে প্রচণ্ড বেগে আকাশের বহুদূরে গিয়ে পড়ল। পড়েই সেও নিজের মেরু-দণ্ডের উপর ঘুরতে লাগ্‌ল।

এমনি করে লক্ষ লক্ষ বছরে ঐ বড় নীহারিকা থেকে প্রথমে জন্মাল প্লুটো, তারপর নেপচুন, তারপর ইউরেনাস, তারপর শনি, শনির পর বৃহস্পতি, বৃহস্পতির পর আর একটা গ্রহ ছিল, তারপর মঙ্গল, তারপর পৃথিবী, পৃথিবীর পর শুক্র, সব শেষে বুধ। গ্রহ যে কেবল এই কয়টি তা নয়, ছোট ছোট আরও অনেকের খবর জানা গেছে। কিন্তু তাদের বলা উচিত গ্রহের টুক্‌রো।



'ইকথিয়োসরাসটা একটা ছোট টেরোড্যাকটিলকে ধরেছে'

অনুমান করা যাচ্ছে, বুধের পর আরও একটা গ্রহ আছে।

এমনি ভাবে গ্রহগুলো তো জন্মাল ; আবার তাদের গা থেকে জন্মাল তাদের চাঁদগুলো।

এরা জন্মাবার পরও নীহারিকাটির কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকল। সেই অবশিষ্ট অংশই সূর্য্যদেব। সূর্য্যের বুক থেকে এরা জন্মেছে ; এদের সকলকে গ্রহ বলা হয়। এদের ওপর সূর্য্যদেবের বড় মায়া ; তিনি সকলকে টেনে রেখেছেন। এরাও তাঁকে কেন্দ্র করে সেই এক সুদূর অতীত কাল থেকে এর চারপাশে ঘুরছে। আবার গ্রহগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তাদের চাঁদগুলো।

বোধহয় প্লুটোর নাম এর আগে শুনিস্ নি? এতকাল লোকে জানত নেপ্চুনই বুঝি আমাদের সৌরজগতের শেষ সীমা। কিন্তু বছর কয়েক আগে আমেরিকার এক জ্যোতিষী প্লুটোকে আবিষ্কার করেছেন। ওটা সূর্য্যের কাছ থেকে বহুদূরে আছে।

তোরা হয়তো মনে করিস্, সব গ্রহেরই বুঝি পৃথিবীর মতো একটা করে চাঁদ আছে ; তা কিন্তু নয়। বুধ আর শুক্রের চাঁদ নেই-ই।

আবার পৃথিবী ছাড়া, কারো দুটো, কারো চারটে, কারো বা দশটা চাঁদ। আমাদের পৃথিবীতে একেবারে অমাবস্যা হয় ; কিন্তু ওদের জ্যোৎস্নার অভাব হয় না ; প্রতি রাতে একটা না একটা চাঁদ উঠ্ছে ডুবছে। কারো কারো আবার দুটো তিনটে চাঁদেরও একসঙ্গে পূর্ণিমা হয়।

দুঃখের বিষয় গ্রহগুলো প্রাণিশূন্য, বায়ুশূন্য, উত্তপ্ত দেশ। সে জ্যোৎস্না দেখ্বে কে?

নক্ষত্রলোকে আর একটা মজার জিনিস আছে—ধূমকেতু। এরা এক অজানা আকাশ থেকে এসে অজানা আকাশে চলে যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে আসে, কেউ কেউ আর আসে না। তারা কোথায় যায়, কি হয়, জানি না।

তারপর শোন্! গ্রহগুলো তো জন্মাল; কিন্তু তখনও সব গরম গ্যাস হয়ে আছে। সেই গ্যাসপিণ্ড একটু একটু করে তাপ ছাড়তে ছাড়তে ক্রমে জমে যেতে লাগল। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল জমে গেছে; বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি এখনও ভাল করে জমেনি। সূর্য্য সকলের চেয়ে বড় বলে আজও জমে যাননি। কিন্তু মহাকাশে অহরহ তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। উনিও লক্ষ লক্ষ বছর বাদে একদিন হয় তো তাপ হারিয়ে জমে যাবেন। সেদিন কোথায় বা থাকবে আমাদের পৃথিবী, কোথায় থাকব আমরা!

আর একটা মজার কথা শোন্। ঐ যে নক্ষত্রগুলো দেখিস্, ওগুলো এক একটা সূর্য্য—দু'একটা হয় তো আমাদের সূর্য্যের চেয়ে ছোট, অধিকাংশই সূর্য্যের চেয়ে ঢের বড়। ওদের চারধারে হয়তো গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরছে। ওরাও সব জন্মেছে আমাদের সৌরজগতেরই মতো একটা নীহারিকা থেকে। ওদের অধিকাংশই এখনও গ্যাসের অবস্থায় আছে।

তোরা হয়তো ভাবছিস্ গ্যাস থেকে আবার এসব হল কি করে? কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। কেন একথা বল্ছি, শোন্।

খুব বেশি তাপ দিলে যত কঠিন জিনিসই হোক্ না, গ্যাস হয়ে যায়। সূর্য্য গ্যাসে গড়া। কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে যে-সব ধাতু-অধাতু আছে, সূর্য্যেও সে-সব গ্যাসাকারে আছে। কাজেই বুঝতে

পারছিস্, পৃথিবী যখন গ্যাসাকারে ছিল, আজ যে-সব ধাতু-অধাতু এতে দেখ্ছিস্, তখনও সব গ্যাসরূপেই ছিল। ক্রমে জমে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনে দিনে এমন বিচিত্র রূপ ধরেছে।

তবে আমাদের সৌরজগৎটা যে ঠিক ঐ ভাবে সৃষ্ট হয়েছে একথা কিন্তু জোর করে বলা চলে না।

কোন কোন পণ্ডিত আবার অদ্ভুত কথা বলেন। তাঁরা বলেন, নীহারিকা আছে সত্য ; কিন্তু আমাদের সৌরজগৎ তা থেকে তৈরী হয়নি। আকাশে কত তারা আছে, যারা মৃত, যাদের আলো নেই। যেমন একদিন হবে আমাদের সূর্য্যের দশা। সেই আলোক-হীন বা মৃত তারকাগুলোও আকাশপথে ছুটে চলেছে! এই ধরণের দুটো মৃত তারকা কোন্ এক অতীত কালে ছুট্‌তে ছুট্‌তে কাছাকাছি হয়েছিল। প্রত্যেক জিনিসেরই টানবার ও ছাড়বার শক্তি আছে। যে যত বড়, তার টান তত বেশি।

নক্ষত্র দুটো কাছাকাছি হতেই সে কি টানাটানি—ধাক্কা লাগে আর কি! কিন্তু শেষ অবধি ধাক্কা লাগ্‌ল না, কেবল তাদের পরস্পরের প্রচণ্ড ঘর্ষণে সৃষ্টি হল একটা বিশাল জ্বলন্ত পিণ্ডের।

তারপর সে দুটো নক্ষত্র ছুট্‌তে ছুট্‌তে অন্যপথে চলে গেল। কিন্তু ঐ জ্বলন্ত পিণ্ডটি প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে লাগল। ঐ জ্বলন্ত পিণ্ডই সূর্য্য ; উনিই এ সৌরজগতের মূল।

আবার কেউ কেউ বলেন, আরও অন্য কথা।

তোরা দেখেছিস্, রাতের আকাশ থেকে সহসা এক একটা নক্ষত্র খসে পড়ে। ওগুলো যে নক্ষত্র নয়, তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝ্‌তে পারছিস্? ওগুলো উল্কা। নিশিদিন উল্কা-বৃষ্টি হচ্ছে। তাদের কতক

জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কতক পৃথিবীতে এসে পড়ছে। ঐ উল্কারাশিই একত্র হয়ে ক্রমে আমাদের পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগুলোকে গড়ে তুলেছে।

নানা মুনি, নানা মত! আমরা কিন্তু প্রথমটাই মেনে নিয়েছি।

সৌরজগতের অন্য সব গ্রহ-উপগ্রহের কথা ছেড়ে দিয়ে, এখন পৃথিবীর কথাই শোন্।"





সম্মুখ পার্শ্ব

স্প্রীংয়ের মত পাকানো নীহারিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর শৈশব ; প্রাণীর সৃষ্টি

"পৃথিবী তো সৃষ্ট হল। কিন্তু তখন এর চারধারে চাঁদ ঘুরত না, এর ওপর জল-বাতাসও ছিল না, সমস্ত পৃথিবীটাই ছিল তপ্ত গ্যাস-পিণ্ড। সেই গ্যাসপিণ্ডের চারধারে ছিল গরম গ্যাসের মেঘ। তখন যদি আমরা পৃথিবীটাকে কোন রকমে দেখ্‌তে পেতাম, তাহলে চিন্‌তেই পারতাম না যে সেটা আমাদের এই সুজলা, সুফলা বসুমতী।

তোরা সকলেই জানিস্ পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার তার মেরুদণ্ডের ওপর ঘোরে। কিন্তু তখন তার শরীর ছিল হাল্কা; সেজন্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে নিজের মেরুদণ্ডের ওপর চার-পাঁচ পাক ঘুরত। ফলে, তার দিনরাত হত চার-পাঁচ ঘণ্টায়।

বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি এখনও একেবারে জমে যায়নি। তাই ওদের দিন-রাত আমাদের দিন-রাতের চেয়ে অনেক ছোট।

এই ভাবে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেল। পৃথিবী ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌তে লাগল, আর তার ওপর একটু একটু করে পাতলা সর পড়তে লাগল, যেমন পড়ে গরম দুধের ওপর। যে-সব ধাতু পৃথিবীতে পাওয়া যায়, এই সময় সেগুলো গ্যাসের অবস্থা থেকে একটু একটু করে জমে তরল হয়ে এল।

তাহলে অবস্থাটা তখন হল এই যে, পৃথিবীর ওপরে পাতলা জমাট সর, নিচে ফুটন্ত তরল পদার্থ, যেন একটা মহাসমুদ্র।

তারপর সুদীর্ঘ কাল কেটে গেল। সে যে কতকাল, তোদের ধারণায় আস্‌বে না। পৃথিবীর তাপ আরও কমে এল; ওপরের সরখানা আরও পুরু ও জমাট হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তখনও পৃথিবীতে বন, গিরি-পর্ব্বত, সমুদ্র ও নদী, এমন কি জলের লেশমাত্রও ছিল না—জল এই অল্প জমাট তপ্ত পিণ্ডের চারধারে ছিল বাষ্পাকারে।

তখনকার অবস্থাটা একবার ভাব্ দেখি। সে গরমও কি কল্পনা করতে পারবি ?

একটু আগেই বলেছি, পৃথিবীর অন্তরে তখন ছিল ফুটন্ত তরল পদার্থের এক মহাসাগর। তাকে বন্দী করে রাখে পৃথিবীর ওপর-কার জমাট পাতলা সরখানার এমন সাধ্য কি ? সেই সাগর থেকে থেকে ঘোররবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তার ধাক্কায় স্তর বা সরখানা ফেটে-ফুটে শত-সহস্র চির হয়ে চারধারে ও শূন্যে ছিট্‌কে যায়। আর সেই পথে তপ্ত তরল পদার্থসাগর হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে চারধারে ছড়িয়ে পড়ে। এখন যেমন জোয়ারের জল ঘোর কলরোল তুলে, ফুলে, ফেঁপে, ফেনিয়ে ছুটে চলে, কেউ তার গতিরোধ করতে পারে না, তখনও পৃথিবীর অন্তর থেকে তরল পদার্থরাশির জোয়ার চারধারে ছুটে যেত।

কিন্তু তা আর পৃথিবীর অন্তরে ফিরে আসত না, কিছুদূর গিয়েই ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধত। তারই ফলে ওপরকার সরখানা দিনে দিনে পুরু হয়ে উঠেছিল।

বোধহয়, এই সময়ই একদিন হঠাৎ মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্প হতে লাগল, মহা ঘোর রবে দশদিক্ ভরে উঠ্‌ল, তপ্ত বাষ্পাচ্ছন্ন ম্লান

আকাশ আরও ম্লান হয়ে এল, পৃথিবীর খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ঘুরতে ঘুরতে দূরে সরে গেল।

সেই অংশটাও ছিল তখন পৃথিবীর মত তপ্ত। এই তপ্ত পিণ্ডই আমাদের চাঁদ। অন্য গ্রহগুলোর চাঁদও বোধহয় এমনি করেই সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু চাঁদটা পৃথিবীর কোন্ অংশ থেকে বেরিয়েছিল ?

সম্ভবতঃ, প্রশান্ত মহাসাগর হয়েছে যে জায়গাটায়, ঐ জায়গা থেকে।

চাঁদটা কিন্তু পৃথিবীর গা থেকে বেরিয়েই অত দূরে গিয়ে পড়েনি। ক্রমে সরে গেছে। এমন একদিন ছিল, যেদিন ও ছিল একেবারে আমাদের ঘরের কাছে। তবে, হাত বাড়িয়ে পাওয়া যেত না, ডাকলেও সাড়া দিত না।

এদিকে দিনে দিনে পৃথিবীর তাপ কম্‌ছে ; ওপরের স্তর পুরু হয়ে আসছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ছে ঘন ঘন ভূমিকম্প, ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত। পৃথিবীর চারধারে যে-তপ্ত বাষ্প ছিল, তাও জমাট হয়ে সজল মেঘের রূপ ধরে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সময় ভূমিকম্পের ফলে এদিকে-ওদিকে পাহাড়-পর্ব্বত সৃষ্টি হতে লাগল। তবে সে পাহাড়-পর্ব্বতগুলোর আকৃতি এখনকার পাহাড়-পর্ব্বতগুলোর মতো ছিল না। বৃষ্টিধারা, বাতাস এবং পরে তুষার-স্রোত, এই তিনটির সাহায্যে প্রকৃতি পাহাড়-পর্ব্বতের মূর্ত্তি একটু একটু করে বদ্‌লে দিতে লাগ্‌ল। এই তিন কারিগর মিলে লক্ষ লক্ষ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ওগুলোর নানা রকমের রূপ দিয়েছে, আজও দিচ্ছে, চিরদিনই দেবে।

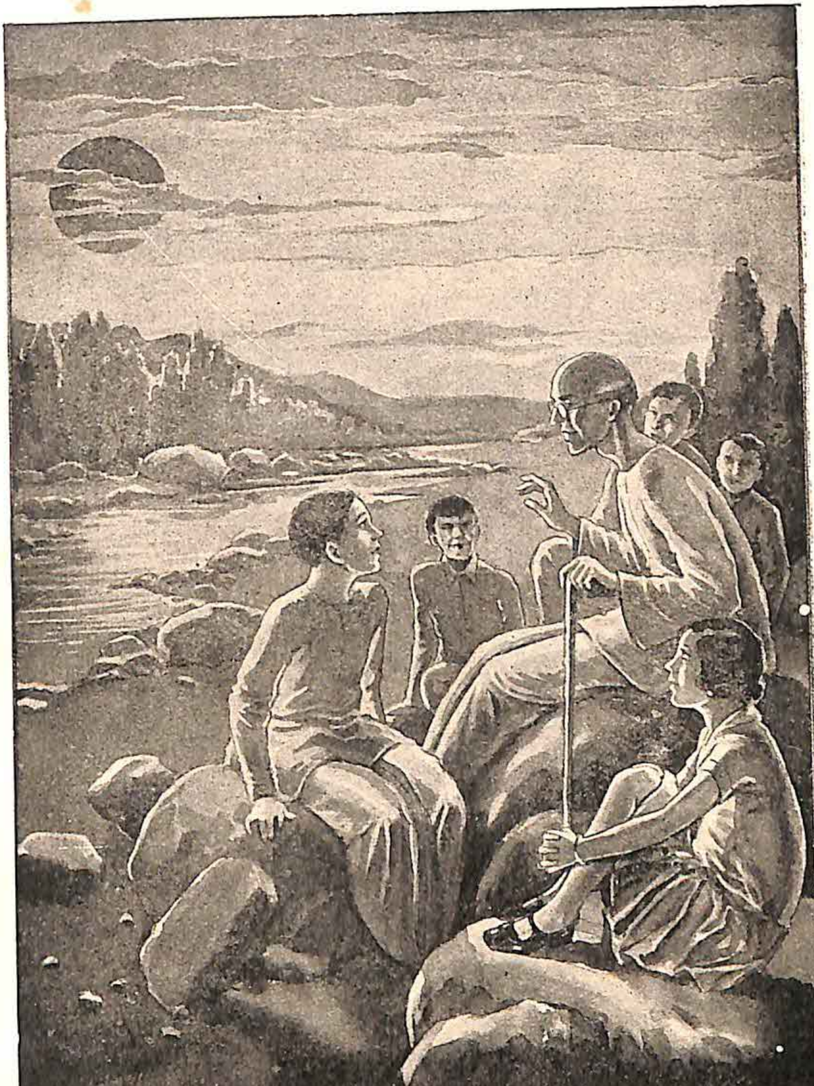
কিন্তু পৃথিবীর কোথাও সমুদ্র তখনও ছিল না। সমুদ্র সৃষ্ট হয়েছিল কবে ?

ক্রমে পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা ও তার ওপর কঠিন সর পুরু হয়ে এল ; তার চারধারের বাষ্পরাশিও ক্রমে জলভারাতুর মেঘ হয়ে উঠেছে। শেষে সেই মেঘভার থেকে একদিন ঝর ঝর ধারায় পৃথিবীর তপ্ত বুকের ওপর বৃষ্টি নাম্‌ল। সেই সঙ্গে প্রবল ঝড়, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চমক ও ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি আরম্ভ হল। এই তাণ্ডবের আর বিরাম ছিল না ; পৃথিবীর বুকে যেন অনন্ত বর্ষা নেমে এল। দিকে দিকে এঁকে-বেঁকে জলধারা ছুটেছে, সারা দিনরাত তার কল কল, ছল ছল শব্দ, সব ঝাপ্‌সা ও ম্লান, দিনরাত্রি একাকার হয়ে এসেছে। এই ধারা-বর্ষণ থেকেই ক্রমে সৃষ্ট হল নদ-নদী ও মহা-সমুদ্রের।

কিন্তু তখন সমুদ্র এমন গভীর, লবণাক্ত ও ঠাণ্ডা ছিল না। পৃথিবীর তাপ কমে এসেছিল সত্য, তবে এখনকার মতো অবস্থা তখনও হয়নি। চারধারের বাতাস গরম, পৃথিবীও গরম, জল শীতল হবে কি করে ?

ভাবছিস্‌, পৃথিবী এখন ঠাণ্ডা হয়েছে। হাঁ, ওপর দিকে তাই বটে। চারধারের বাতাসও ঠাণ্ডা। কিন্তু পৃথিবীর অন্তরে এখনও আগুন আছে—যত নিচে নেমে যাবি তত গরম। শেষে নিচে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছবি যেখানে সব তপ্ত তরল ; শুনিস্‌নি, আগ্নেয়গিরির অন্তর থেকে আগুন ও কত গলিত পদার্থ বার হয় ? এসব আসে কোথা থেকে ? তবে এমন একদিন আসবে যেদিন পৃথিবীর অন্তরের আগুনও নিভে যাবে।

পৃথিবীর অন্তরের আগুন যে ধীরে ধীরে কম্‌ছে, তার প্রমাণ



ঠাকুরদা নাতি নাতনীদের নিয়ে গল্প বলছেন

আগ্নেয়গিরি ও বড় বড় ভূমিকম্পের সংখ্যা। বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরি আজ মৃত। তাদের শূন্য কটাহগুলো মাত্র পড়ে আছে। যেগুলি জীবন্ত সেগুলিও আর প্রাচীনকালের মতো ঘন ঘন অগ্ন্যুদ্গম করে না। আবার প্রাচীন কাহিনী ও পুরাণে যে-সব আগ্নেয়গিরির গল্প আমরা শুনি, তাদের কারো কারো সন্ধানই আজ আর পাওয়া যায় না।

সমুদ্র সৃষ্ট হবার বোধহয় কয়েক লক্ষ বছর পরেই পৃথিবীতে প্রাণী দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কি করে, কোথা থেকে সেগুলো জন্মাল তা জানা যায় না।

প্রথমে যে প্রাণীগুলো জন্মাল তাদের হাত-পা-চোখ-কান-নাক কিছুই ছিল না। শরীরে হাড়-মাংসও ছিল না; শরীরের ওপর এক শক্ত খোলাও ছিল না। সারা শরীরটাই ছিল জেলীর মতো নরম জিনিসে তৈরী। আকারেও ছিল তা একটুখানি। খালি চোখে তাদের প্রাণী বলে চেনাই কঠিন।

এরা বংশ বিস্তার করত বড় মজার উপায়ে। বংশ-বিস্তারের সময় এদের নরম তুলতুলে শরীরটা একটু লম্বা হয়ে দুই মুড়ো ডাম্বেলের মত ফুলে উঠত আর মাঝখানটা হত সরু। শেষে সেখান থেকে সেটা দুভাগ হয়ে যেত।

প্রাণীগুলো সমুদ্র-কূলে ভেসে বেড়াত। সমুদ্র-জলেই বংশ বিস্তার করত; আবার মৃত্যু হলে সমুদ্রের তলায় ঝরে পড়ত। কিছুতেই তারা জলের বাইরে যেত না। কেউ জলের বাইরে গেলেই শুকিয়ে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হত। কেননা, ডাঙায় তখন প্রচণ্ড তাপ।

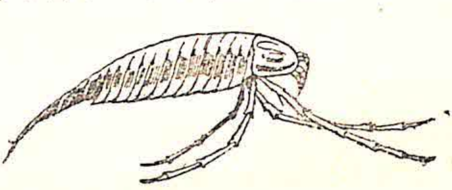
কেবল সমুদ্র কেন, বৃষ্টি-জলে যে-সব হ্রদ ও খাড়ি তৈরী হয়েছিল, সেগুলোতেও এরা জন্মাত। জল ছাড়া ডাঙায় কোথায়ও তখন প্রাণীর থাকবার মত সুবিধা ও আবহাওয়া ছিল না।

প্রাণীগুলো জলে থাক্‌ত বটে, কিন্তু কখনও গভীর জলে যেত না; আলো-বাতাসের জন্যে সর্ব্বদা কূলের কাছে কাছে থাক্‌ত।

এমনি ভাবে পৃথিবীর বহুকাল কেটে গেল।

আকাশে ও ডাঙায় সমানে ভয়ানক দুর্য্যোগ চল্‌ছে। তারি ফলে মহা সমুদ্রের মাঝ থেকে এদিকে-ওদিকে একটু একটু করে ডাঙা জেগে উঠ্‌ছে।

ক্রমে তাপ আরও কমে এল। কিন্তু ডাঙা তখনও প্রাণিশূন্য; জলেও বড় প্রাণী কিছুই দেখা দিল না। যারা দেখা দিল, তাদেরও শরীরে জেলী-প্রাণীর মতো হাড় নেই। তবে তাদের গায়ের ওপরে কঠিন খোলা; আকারও নানা রকমের, স্বভাবও বিভিন্ন। সেগুলোর মধ্যে আমাদের এখনকার চিংড়ী, কাঁকড়া-বিছে, শামুক প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল। তখনকার এক একটা চিংড়ী ও কাঁকড়া-বিছে লম্বায় হত সাত-আট হাত।”



সমুদ্র-বৃশ্চিক

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর ইতিহাসের যুগবিভাগ—মেরুদণ্ডীদের আবির্ভাব

অশোক বল্‌লে—"ঠাকুরদা, তুমি বল্‌ছ সে সময় মানুষ ছিল না; কেউ এসব দেখেনি! তবে কি করে জান্‌লে তাদের কথা?"

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ভালকথা জিজ্ঞাসা করেছিস্! এ-সব যখন ঘটেছিল তখন কেউ ছিল না সত্যি, কিন্তু মহাকাল পৃথিবীময় পাষাণফলকে তখনকার নানা কাহিনী লিখে রেখে দিয়েছে। আজও যা ঘট্‌ছে তাও সে তোর-আমার চোখের আড়ালে বসে একমনে লিখে যাচ্ছে। আবার আমাদের বহু পরে যারা এই পৃথিবীতে আসবে, তারা তা দেখ্‌বে। তবে সে ভাষা জানা চাই। পণ্ডিতেরা জানেন; তাই তাঁরা সে-সবের পাঠোদ্ধার করছেন।

আমরা সেই সুদূর অতীতের পৃথিবীর কথা যা-কিছু জান্‌ছি সবই তো পাথর থেকে।

এই চোখের সামনে যে-সব পাথর চারধারে ছড়ানো দেখ্‌ছিস্, যেগুলোর ওপর আমরা বসে আছি, এগুলো কি করে তৈরী হয়েছে জানিস্?

তোদের বলেছি, পৃথিবীর অন্তর থেকে তপ্ত তরল পদার্থরাশি প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে চারধারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে জমে পৃথিবীর ওপরকার স্তরের সৃষ্টি করেছে। সেই স্তরই

আবার কালক্রমে পাথরে পরিণত হয়েছে। তাহলে বুঝতে পারছিস্ পৃথিবীর আদিস্তর 'অগ্নিজ পাথর'।

আবার যখন পৃথিবীতে প্রথম বৃষ্টি পড়তে শুরু হল, একটু একটু করে নদ-নদী বইতে আরম্ভ করলে, পৃথিবীর বুক জুড়ে সমুদ্র দেখা দিল, তখন সেই জলস্রোতে ও বৃষ্টি-ধারায় ডাঙার সূক্ষ্ম কণারাশি সমুদ্রে ও নানা দিকে ভেসে গিয়ে দিনে দিনে পলি পড়ার মতো জমা হতে লাগ্‌ল। তা আবার কাদা হয়ে গেল। সেই কাদা ক্রমে শ্লেট, চুনাপাথর ও বালি, আর বালি থেকে —বালি-পাথর প্রভৃতির সৃষ্টি করলে। পৃথিবীর ওপর এই 'জলজ স্তরের' পাথর নানা জায়গায় আছে। স্তরখানা কম পুরু নয়।

কেবল কি ঐ দুই রকমেই পাথরের সৃষ্টি হয়েছে? নানা রকমের রাসায়নিক ক্রিয়া ও তাপও পাথর-সৃষ্টির কারণ।

পৃথিবীতে যত পাথর আছে, সব এই তিনটে শ্রেণীতে পড়ে। এইগুলোই পৃথিবীর নানা স্তর সৃষ্টি করেছে। তাই বলে, স্তরগুলো কিন্তু সব জায়গায় পর পর সাজানো নেই। আর পৃথিবীর উপরিভাগে কেবল তিনটি স্তর নয়, এক এক জাতের পাথরের নানা বিভিন্ন রকমের স্তর আছে; মাটির স্তরও আছে। স্তরগুলির আকৃতিও নানা রকমের। ভূমিকম্পে, অগ্ন্যুৎপাতের প্রচণ্ড চাপে, জল-স্রোতের প্রবল ধাক্কায় জায়গায় জায়গায় স্তরগুলি এলোমেলো হয়ে গেছে। কোথাও ওপরেরটা নিচে নেমেছে, নিচেরটা ওপরে উঠে এসেছে—কোন কোনটা ভেঙে-গুঁড়িয়ে, কুঁচ্‌কে, বেঁকে একাকার। চিরদিন কোন জিনিসই একভাবে থাক্‌তে পারে না। কিছু কিছু বদ্‌লে যাবেই।

তাহলে বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌, যে-স্তর যত পুরোনো সে-স্তর পৃথিবীর তত নিচে নেমে গেছে। এক একটা সময় এসেছে, নানা কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া বদ্‌লে গেছে ; আর তারি সঙ্গে তাল রেখে হয়েছে নতুন নতুন সৃষ্টি। সে সৃষ্টিও চিরদিন থাকে নি ; মৃত্যু তাকে ধ্বংস করে আবার নতুনের জায়গা করে দিয়েছে।

কিন্তু যাদের ধ্বংস করেছে, তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি। তাদের দেহ-কঙ্কাল পাথর, কয়লা, খড়ি-পাথর বা বালি-পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর নানা স্তরে আজ আমরা এদের সন্ধান পাচ্ছি।

কয়লা বা চুনা-পাথরে, পাহাড়-পর্ব্বতের গুহা-কন্দরে, বিজন মরুভূমিতে, নদীগর্ভে, সমুদ্রতীরে সেই সুদূর অতীতের কত বিচিত্র কাহিনী পাষাণে পাষাণে লেখা রয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসকে মোটামুটি পাঁচটি যুগে ভাগ করা হয়েছে ; প্রথম যুগটার নাম প্রাণিশূন্য যুগ, দ্বিতীয়টা প্রাচীনতম প্রাণীর যুগ, তৃতীয়টা প্রাচীন প্রাণীর যুগ, চতুর্থটা মধ্য প্রাণীর যুগ, পঞ্চমটা বর্ত্তমান যুগ। এটা আজও চল্‌ছে ; কবে এর শেষ হবে জানি না। নাটকের অঙ্কগুলো যেমন নানা গর্ভাঙ্কে বা দৃশ্যে ভাগ করা হয়ে থাকে, এই পাঁচটি বড় যুগকেও তেমনি অনেক ছোট ছোট যুগে ভাগ করা হয়েছে। কোন যুগই কিন্তু বিশ-পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে নয়—লক্ষ লক্ষ বছর ব্যেপে।

প্রাণিশূন্য যুগের পৃথিবীর অবস্থার গল্প তোদের আগে বলেছি। প্রাচীনতম প্রাণীর যুগের কথা এক রকম বলা হয়েছে। প্রাচীনতম

যুগে যে প্রাণী ছিল বলে অনুমান করা হয়, তার কথা তোরা হয়তো এখনও ভুলে যাস্ নি ?

এখন প্রাচীন যুগের কথা মন দিয়ে শোন্। এর কথাও আগে কিছু বলেছি।

জল ছাড়া তখন ডাঙায় বাঁচবার উপায় ছিল না। সেইজন্যে এ যুগের প্রাণীরা জলেই থাকত।

তখন অনেক রকম কাঁকড়া-বিছে দেখা দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে আরও নানা রকম প্রাণী জন্মেছিল। তাদের আকারও ছিল নানা রকমের। কিন্তু এখন আর তাদের কারুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে জীবন-যুদ্ধে যারা জয়ী হয়েছে, তাদেরই বংশধর আজও বেঁচে আছে; আজও পৃথিবীর নানা জায়গায় জলে ও ডাঙায় তাদের বংশধরগণকে দেখা যায়।

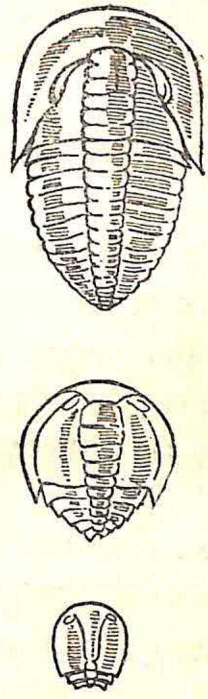
এই প্রাণীদের মধ্যে লিঙ্গুলা আর ত্রিবলীর (ট্রিলোবাইট) নাম শুনে রাখ। শেষের প্রাণীটাতে জল একেবারে ছেয়ে গিয়েছিল। তারা এক ইঞ্চি থেকে দু'ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হত। এদের মধ্যে কেউ কেউ বাস করত গর্ত্তে। যারা গর্ত্তবাসী ছিল, তাদের চোখ ছিল না— তারা ছিল চির অন্ধ। আর যারা জলে ভেসে বেড়াত, তাদের চোখ দুটো ছিল বড় বড়। এদের কারো শরীরের ওপর থাক্‌ত কাঁটা, কারো লেজ হত চিংড়ীমাছের লেজের মতো। তাদের শত্রু ছিল কাঁকড়া-বিছে ও ঝিনুক।

ত্রিবলীদের খাদ্য ছিল শেওলা, পাঁক ও তাদের চেয়েও ছোট ছোট প্রাণী। কিন্তু সকলেই যে এ-সব খেত তা নয়, কেউ কেউ নিরামিষাশীও ছিল।

চিংড়ী আর কাঁকড়া-বিছেকে তোরা খুব চিনিস্! এগুলোর আকৃতি এখনও সেই তখনকার মতোই প্রায় আছে। সে-সময়কার ত্রিবল্লীদের বংশধর হল চীনদেশের রাজা-কাঁকড়া (king crab)। কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষদের সঙ্গে এদের আকারে বিশেষ মিল নেই, সেইজন্য এদের ট্রিলোবাইটদের বংশধর বলে চেনা কঠিন। প্রাণীটার এমন গাল-ভরা নাম হলেও কেউ কিন্তু এদের খায় না। এরা নিতান্ত অনাদরে ঘুরে বেড়ায়। সে-যুগেও এদের দেখা গিয়েছিল।

মাকড়শা তোরা সকলেই দেখেছিস্, তখনও মাকড়শা ছিল। কিন্তু ডাঙায় নয়, জলে। তারা আজকালকার মতো এমন জাল বুনত না। শিকারের সন্ধানে জলের চারধারে ঘুরে বেড়াত। এখনকার মতো তখনও মাকড়শা ছিল অনেক রকমের।

সেই সুদূর অতীতের আরও দু' রকমের সামুদ্রিক প্রাণী দেখা যায়—এমোনাইট আর নটিলাস। এরা অবশ্য শামুক-জাতীয় প্রাণী।



ট্রিলোবাইট

এই সময়টাতে কেবল যে অসংখ্য খোলসধারী প্রাণী দেখা দিয়েছিল, তা নয়, দু'এক রকমের উদ্ভিদ্‌ও ছিল। কিন্তু সেগুলো সব শেওলা-জাতীয়। তারাও থাকত জলে। সম্ভবতঃ সেগুলো ছিল তখনকার জলচর প্রাণীগুলোর খাদ্য। তবে

কেবল যে শেওলা খেয়েই তারা বেঁচে থাকত, তা বলা যায় না। তারা নিজেদের মধ্যেও মারামারি করত এবং ক্ষুধার সময় নিজেদের সন্তান-সন্ততি বা স্বজনদেরও খেতে কুণ্ঠিত হত না।

খোলস থাকার দরুণ এই-সব প্রাণী হয়তো জলে একটু একটু পিঠ ভাসাত, জল থেকে ওঠ্‌বারও চেষ্টা করত। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। বেশিক্ষণ জলের ওপরে ভেসে থাকে এমন সাধ্য কি!

যদিও তখন প্রচণ্ড ঝড়, প্রবল বর্ষণ হচ্ছে, তবুও বাতাস গরম, রৌদ্রের তাপ অতি প্রখর। তার মধ্যে ওরকম প্রাণী কি বাঁচতে পারে? তাই তারা সহজে জলছাড়া হত না। যদি কেউ ঢেউয়ের ধাক্কায় বা অন্য কোন কারণে ডাঙায় গিয়ে পড়ত, তাহলে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হত। আর, শেওলাগুলো তো জলের সঙ্গে মিশিয়েই থাকত। যেটুকু বাড়ত সেটুকুও জলে জলে। তবে গভীর জলে নয়। প্রাণ বাঁচাতে হলে উদ্ভিদেরও তো আলো-বাতাস চাই।

ডাঙায় তখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড চলছিল। সমুদ্র ঘোর রবে গর্জ্জন করতে করতে কূলে কূলে আছড়ে পড়ছে। সেই আঘাতের পর আঘাতে কূলের পাহাড়-পর্ব্বত ক্ষয় হচ্ছে, মাটি ধুয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীও ভূমিকম্পে থর্ থর্ কাঁপছে, শত শত আগ্নেয়গিরি থেকে আগুনের শিখা, ধূম ও তপ্ত তরল পদার্থ প্রচণ্ড বেগে বার হয়ে আকাশের বহু ওপরে উঠে চারধারে ছড়িয়ে পড়ছে। বাষ্পে, গন্ধে, গরমে বাতাস ভারী।

এমনি ভাবে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেল। এই সময়ের মধ্যে

অতীতের পৃথিবী—



বায়ুবিক্ষিপ্ত মেঘের মত নীহারিকা
(কালপুরুষের কোমরবন্ধনীতে আছে)

পৃথিবীর অবস্থা আরও কিছু বদ্‌লে গেল। জলে আবার নতুন প্রাণী দেখা দিল—মাছ। এই মাছেদের বংশধরেরাই পৃথিবীর আদি মেরুদণ্ডী প্রাণী। তার আগে যারা ছিল, তাদের কথা তো শুন্‌লি! উদ্ভিদের মধ্যে শেওলা তো ছিলই, সেই সঙ্গে দেখা দিল, আজকাল-কার ঢেঁকীশাকের মতো এক রকম উদ্ভিদ্। কিন্তু সবই জলে।

হয়তো বল্‌বি, তখন মাছ ছাড়াও যে অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণী ছিল না একথা কেমন করে বলতে পার? তা যদি হবে, তাহলে সে যুগের স্তরে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও তাদের চিহ্ন থাক্‌বে। তা কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ ছিল না।

মাছগুলো দেখা দেবার আগে থেকেই যে-সব খোলসধারী প্রাণী ছিল, তাদের মধ্যে কারো কারো সংখ্যা কমে যেতে লাগল, কারো কারো সংখ্যা বাড়তে লাগল, কেউ কেউ আকারেও কিছু বড় বা ছোট হল। যারা কমে যাচ্ছিল, তারা শেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাদের মধ্যে চিংড়ী, কাঁকড়া-বিছে, শামুক, প্রবাল-উৎপাদক প্রাণী ও টেরিগোটাস প্রধান। আর, চীনদেশের রাজা-কাঁকড়ার পূর্ব্বপুরুষ ট্রিলোবাইটরা দলে তখন এত ভারী হল যে, বলা যায় না। এরা কি করে আত্মরক্ষা করত, তা তোদের বলি নি। সজারু ও বনরুইরা যেমন ভয় পেলে শরীর পাকিয়ে গোল হয়ে পড়ে থাকে, তারাও তেমনি আত্মরক্ষা করবার সময় তালগোল পাকিয়ে যেত। যে-সব ট্রিলোবাইট ঐ যুগের স্তরে পাওয়া গেছে, সেগুলো অমনি তালগোল পাকিয়ে ছিল। এই থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, তারা দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

চারধারের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে না চল্‌লে, এ পৃথিবীতে কারো

টিঁকে থাকবার উপায় নেই। দুর্ব্বল, অবিবেচক বা নির্ব্বোধ যে, সে শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যায়। প্রকৃতি তাকে কিছুতেই পৃথিবীতে রাখে না।

কি করে জেলী প্রাণীর পর খোলসধারী প্রাণী, তারপর মাছ হল, তা বলা বড় কঠিন। তবে এইটুকু বলা যায়, ঐ ধরণের প্রাণী ছাড়া আর কোন প্রাণীর তখন বেঁচে থাকবার উপায় ছিল না। সেইজন্যে পূর্ব্বযুগের প্রাণীগুলো আবহাওয়া ও শত্রুর সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করে ঐ অবস্থায় পরিণত হয়েছিল।

মাছের নাম শুনে তোরা ভাবছিস, তখন বুঝি এখনকার মতো রুই, কাতলা, ইলিস ছিল ! তা নয়।

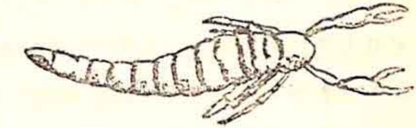
সে-সব মাছের চেহারা ছিল বড় অদ্ভুত। তাদের গায়ে এমন আঁশ ছিল যে, সে-সব আঁশকে বর্ম্ম বলা যেতে পারে। কোন কোন মাছের গা আবার একখানি মাত্র সোনালী বা রূপালী ঝক্‌ঝকে খোলায় আগাগোড়া ঢাকা থাকত। কী চমৎকার দেখতে ছিল সেগুলো ! হ্রদ বা সমুদ্রের নীল জলে যেন সোনা বা রূপোর মাছ চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে ! সে মাছগুলোর নাম গ্যানোই।

গ্যানোইয়ের কঙ্কাল, কঙ্কাল কেন, কতকগুলো সম্পূর্ণ গ্যানোইকেই পাথুরে অবস্থায় পাওয়া গেছে। তারা তো ছিল কত লক্ষ লক্ষ বছর আগে ; তবুও তাদের পাথুরে শরীরে সেই আগেকার মূর্ত্তি একটুও বদলায় নি।

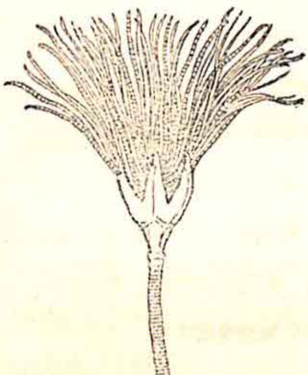
এই যুগে মাছ প্রথম দেখা দিলেও কিন্তু তারা আকারে বিশেষ বড় ছিল না। যে-সব পাথুরে মাছ পাওয়া গেছে, সবই ছোট ছোট।

তাদের শত্রু ছিল টেরিগোটাস্। এক একটা টেরিগোটাস্ লম্বায়

হত প্রায় সাড়ে তিন হাত। এই মৎস্যভুক্‌দের সামনে কোন মাছ পড়লে তার আর রক্ষা ছিল না। সেই জন্যে মাছেরা সর্ব্বদা সাবধানে চলাফেরা করত। তবুও কি রক্ষা আছে? শত্রুর সঙ্গে



টেরিগোটাস্



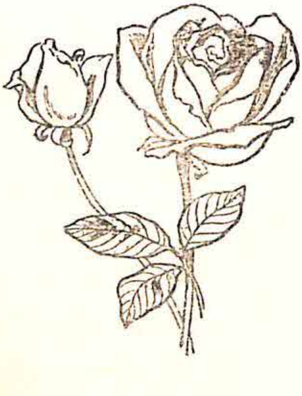
সমুদ্রের পদ্ম

কতক্ষণ পাশাপাশি নিরাপদে বাস করা যায়? এরাও মাছের লোভে লোভে চারধারে ঘুরে বেড়াত। কোন মাছকে দেখ্‌তে পেলেই তার পিছনে তাড়া করে, তাকে বধ করে খেয়ে ফেলত।

এ গল্প শোনবার আগে আমার কাছে তোরা অনেকবার প্রবাল-দ্বীপের গল্প শুনেছিস্। যে-প্রাণী প্রবাল তৈরী করে, তারাও এ-যুগে সমুদ্রের জলের চারধারে থাক্‌ত! তবে আজকালকার মতো বিচিত্র প্রবাল-দ্বীপ গড়ে তুলতো কি না জানি না। আবার ঐ সঙ্গে—সঙ্গে কেন—প্রথম খোলসধারী প্রাণীদের সময় থেকেই আর এক রকমের প্রাণী ছিল, সেগুলোকে এক শতাব্দী পূর্ব্বেও সমুদ্রের তলায় দেখা গেছে। সেগুলোকে লোকে বল্‌ত—সমুদ্রের পদ্ম।

পদ্মই বটে। একটা থরকাটা ডাঁটা, ওপরে লম্বা লম্বা পাপড়ি। এটি সমুদ্রের তলায় জলের নিচে পাহাড়ের গায়ে পাপড়ি মেলে লেগে থাক্‌ত। আজ আর এদের পৃথিবীর কোথায়ও খুঁজে পাবি না। এরা মানুষের জ্ঞানের বাইরে এক জায়গা থেকে এসেছিল, আবার মানুষের জ্ঞানের বাইরে এক জায়গায় চলে গেল।

আর একটা মজার কথা বলি শোন্। কোন নতুন প্রাণীর সৃষ্টি হবার আগে সৃষ্ট হয়েছে তার খাদ্য। খাদ্য ছাড়া প্রাণী বাঁচে? এ নিয়ম সর্ব্বত্র—কি ডাঙায়, কি জলে। আমার কথা সত্যি কিনা পরে দেখ্‌তে পাবি। এই সঙ্গে আর একটা কথা জেনে রাখ্—সকল প্রাণীরই কোন না কোন রকমের আত্মরক্ষার অস্ত্র আছে—কারো রং, কারো আকৃতি, কারো বুদ্ধি, কারো শক্তি, কারো বা কোন তীক্ষ্ণধার অঙ্গ যা সময়-বিশেষে মারাত্মক অস্ত্রস্বরূপ।"



চতুর্থ অধ্যায়

মাছের যুগে গাছের আবির্ভাব

"যে মাছগুলো সব প্রথমেই দেখা দিয়েছিল, তাদের কিন্তু ঠিক মাছ বলা চলে না। তাদের আকৃতিটা ছিল মাছের মতো; ভিতরে না ছিল কাঁটা ও মেরুদণ্ড, না ছিল শরীরের ওপর সাঁতার দেবার ডানা। সারা শরীর ছিল একখানা খোলায় ঢাকা।

ক্রমে লক্ষ লক্ষ বছর চলে যেতে লাগ্‌ল, আর সেই সঙ্গে জলে, ডাঙায়, আকাশে, মেঘস্তরে ও প্রাণিজগতে একটু একটু করে পরিবর্ত্তন চল্‌তে থাক্‌ল।

যে মাছগুলো ছোট ছিল, সেগুলো হয়ে উঠ্‌ল বড়—এত বড় যে, কোন কোনটা লম্বায় হল বিশ হাত। তারা কেবল দৈর্ঘ্যেই বাড়ল না, তাদের শরীরের গঠনও বদলে গেল। তাদের খোসার জায়গায় হল আঁশ, সাঁতার দেবার জন্যে গায়ে ডানা, ভিতরে মেরুদণ্ড ও কাঁটা। এক একটার চেহারা হল কিম্ভূতকিমাকার; স্বভাবও হিংস্র, গায়েও ভয়ানক জোর, আবার মুখে তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতের সারি। তাদের কাছে যায় কার সাধ্য!

কিন্তু মাছের শত্রু টেরিগোটাস্‌ও পাল্লা দিয়ে সমানে বাড়ছিল। মাছের চেহারা যখন এমন, টেরিগোটাস্‌গুলো কি রকম হয়ে উঠেছিল ভাব্‌ত? বলবান্ ও হিংস্রকে পরাস্ত করতে হলে বলবত্তর ও হিংস্রতরেরই দরকার।

তখন বড় বড় হাঙরও দেখা দিয়েছিল। তাদের দাঁতগুলো ছিল এখনকার হাঙরের দাঁতের চেয়ে তিনগুণ বড়—যেন ছুরির ফলা। হাঙরগুলো লম্বায় হত ষাট-সত্তর হাত। কি ভয়ানক ছিল তাদের বিক্রম !

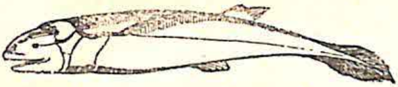
সে-যুগের মাছের চেয়ে এ-যুগের মাছ অনেক সভ্য ; কিন্তু হাঙরগুলোর স্বভাব আর বদ্‌লালো না ; ওদের সেই আদিম যুগের স্বভাবই রয়ে গেল। তবে তখনকার হাঙরের চেহারাটা ছিল আরও ভয়ানক—কোথায় লাগে তার কাছে এখনকার বাঘমুখো বা হাতুড়ি-মুখো হাঙর ! কেবল চেহারায় কেন, লম্বায়ও এখনকার হাঙর তাদের সিকি।

আবার তখন এই রাক্ষুসে প্রাণীগুলোর চেয়েও ভয়ঙ্কর আর এক রকমের মাছ-জাতীয় প্রাণী দেখা দিয়েছিল, তার নাম টাইটান। তার দেহ ছিল অতি প্রকাণ্ড।

আজ আমাদের অনেক নদী-খাল কুমীরে ভরা। নিউটের নামও তোরা শুনেছিস্। শুনিস্ নি ? এরা হল গিরগিটির জাত-ভাই। কুমীর ও নিউট উভচর—এরা জলে-ডাঙায় চরে। সেইজন্য এদের নাম দেওয়া হয়েছে—উভচর। কুমীর তো নদীর চরে বালিতে গর্ত্ত করে ডিম পাড়ে। এদের পূর্ব্বপুরুষ হল, সে সময়ের কোকোস্‌টিগ্নাস্। প্রাণীগুলোর স্বভাব তখনও ছিল রাক্ষুসে, আর চেহারা ছিল কিম্ভূতকিমাকার। দেখে কে বল্‌বে, কুমীরের পূর্ব্বপুরুষ !

এদের সকলের মারামারি, ছুটোছুটি, লাফ-ঝাঁপে সমুদ্র ও হ্রদ সর্ব্বদা তরঙ্গায়িত থাকত। তার সঙ্গে ছিল ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্প

চল্‌ছিল, আকাশ ছিল প্রায় সব সময়ই অন্ধকার, বাতাস ভিজে ও ভারী।



কোকোস্‌টিয়াস্‌

কিন্তু তখনও স্থলভূমি প্রাণিশূন্য ;—কোথায়ও একটি গাছ ছিল না, একটি ছোট পোকাও ছিল না, একখণ্ড তৃণও দেখা যেত না। তবে একটা মাছ-জাতীয় প্রাণী, নাম তার ডিপটেরা, বোধহয় স্বজাতির অসাক্ষাতে জল থেকে মাঝে মাঝে ডাঙায় ওঠ্‌বার চেষ্টা করছে। জলে আর তার ভাল লাগছিল না ; বহু লক্ষ লক্ষ বছর তো জলে জলেই কেটে গেল। তার মন ডাঙার দিকে। তার সেই চেষ্টার ফলেই বোধহয় উভচর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু একদিনের চেষ্টায় তা হয় নি ; তাতেও লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। তাদের বংশধর হল আজকাল-কার লাং মাছ। এরা জলে থাকে, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ডাঙায় ও কাদার মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করে।

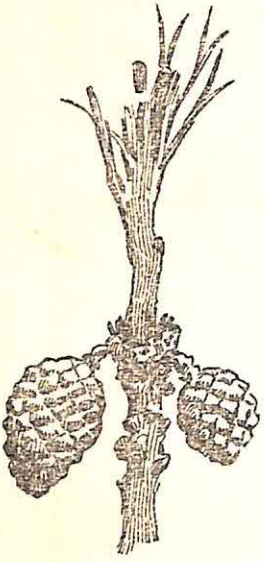


ডিপটেরা

তারপর—বহু লক্ষ বৎসর পর—

বন তখন ডাঙায় সবুজ ধ্বজা উড়িয়েছে। কিন্তু সে-বন বেশিদূর বিস্তৃত ছিল না। সমুদ্র, হ্রদ ও নদীর তীরে তীরে লীলায়িত হয়ে উঠেছিল। আর সে-বনের গাছপালা ছিল মস্‌, ঢেঁকীশাক, নলখাগ্‌ড়া প্রভৃতি। আজকালকার ঢেঁকীশাক হাতখানেক লম্বা হবে, মস্‌ও ছোট ছোট, আর সর বা নলখাগ্‌ড়ার গাছ মানুষের মাথা ছাড়িয়ে

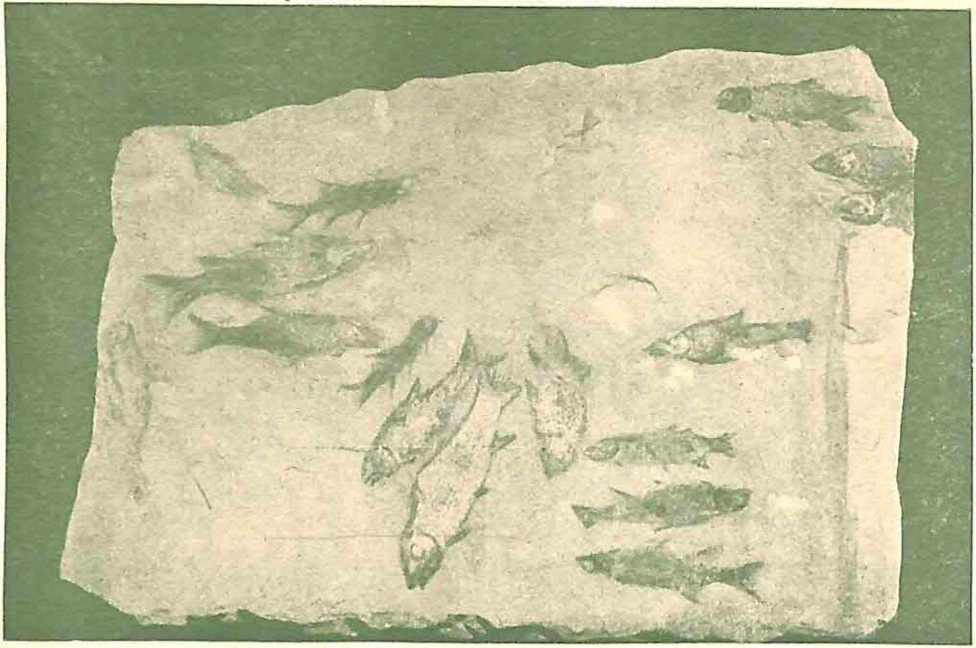
বেশিদূর ওঠে না। কিন্তু এ-সব গাছ তখন ছিল বিশ হাত, ত্রিশ হাত লম্বা ; সেই অনুপাতে মোটা। তবে কোনটাই এখনকার মত শক্ত ছিল না ; তাদের গা ছিল নরম, রসে ভরা। তাদের ডালে ফুল ফুটত না, ফলও ধরত না, পাতাও ছিল না।


পাইন

কেননা, তখনও পৃথিবীতে বসন্তের দেখা নেই ; শীত কোথায় জড়সড় হয়েছিল কে জানে! ছিল কেবল দুটি ঋতু—বর্ষা ও গ্রীষ্ম। বর্ষার অবিরল ধারায় বনশ্রেণী হয়ে উঠেছিল দীর্ঘ ও ঘন। কিন্তু সে বন ছিল প্রাণি-শূন্য ; পাখীর কলরবে বা হিংস্র জন্তুর গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত না। এই প্রাণিহীন, ফল-ফুল-পাতাশূন্য গহন বনের মধ্য দিয়ে বর্ষার সজল বাতাস হাহাকার করে বয়ে যেত।

এই বনে আর একটি গাছ ছিল এখনকার পাইন-জাতীয়। কোন কোন পার্ব্বত্য প্রদেশ আজকালকার পাইনের সুমিষ্ট গন্ধে আমোদিত হয়ে থাকে। কিন্তু সে পাইনের শাখায় শাখায় এমন ফুল ও ফল ধরত না। আর সে পাইন, আজকালকার এ-পাইনও নয়। কিন্তু সকল উদ্ভিদ্ই বংশ বিস্তার করে চলেছিল।

একথা শুনে তোরা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হচ্ছিস্ ;—ফুল নেই, ফল নেই, অথচ বন দিনে দিনে বিস্তৃত হচ্ছে!

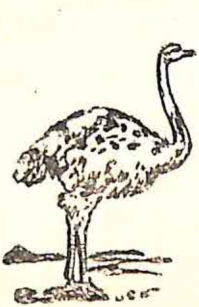


প্রস্তরীভূত মাছ

পৃষ্ঠা—২৮

তা হয়েছে। ফুল-ফল, মৌমাছি ও প্রজাপতি না থাকলেও তাদের বংশ-বিস্তারের অন্য উপায় ছিল। তাদের শাখা থেকে যে-সব 'কোন্' ঝরে পড়ত, সে-সব থেকে হত চারা; সেই চারা বেড়ে হত গাছ। কিন্তু এই সুদূর অতীতকালের বনের ধারে এসে আজ আমরা বিশ্রাম করব। কাল আবার এখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে। প্রাচীন যুগের অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কের চারটি দৃশ্য আমাদের এক রকম দেখা হল। এবার পঞ্চম দৃশ্য।

এই দৃশ্যটি বড় ভয়ঙ্কর; জলে, স্থলে, বনে সর্ব্বত্র ছোট-বড় নানা প্রাণী।"



পঞ্চম অধ্যায়

গহন বনের যুগে—উভচর আর পতঙ্গের রাজত্ব

"এ-যুগের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখ্—ছোট থেকে আরম্ভ করে অতি বিশালকায় অসংখ্য মাছ চারধারে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদের মধ্যে হাঙরের সংখ্যাই বেশি। আবার ধূলিকণার মতো প্রবাল-উৎপাদক সূক্ষ্ম প্রাণীতেও সমুদ্রের জল ঘোলাটে। এরাও সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে; তবে কোথাও কম, কোথাও বেশি। তখন যদি কোন রকমে জলের নিচে যাওয়া যেত, তাহলে নিশ্চয়ই দেখ্তে পেতিস্ এই সব ক্ষুদে প্রাণীদের মৃতদেহ ওপর থেকে বৃষ্টিধারার মত সমুদ্রের তলায় নিশিদিন ঝরে পড়ছে। তখন বুঝতেই পারতিস্ না যে, এই অতি তুচ্ছ দেহকণা লক্ষ লক্ষ বছরের শেষে পৃথিবীর গায়ে চুনা-পাথরের স্তরের সৃষ্টি করবে। আর, সেই স্তরের ওপর নতুন দৃশ্যে নতুন অভিনয় হবে।

সমুদ্র ছাড়াও পৃথিবীর চারধারে যে বড় বড় জলাশয় ছিল, সেগুলোতেও নানা জলজ প্রাণীর দেহ-কঙ্কালে ধীরে ধীরে বালি-পাথরের সৃষ্টি হচ্ছিল। সে-সব জায়গায় মাছ ও নানা রকমের ছোট ছোট প্রাণীরও অভাব ছিল না।

এ যুগে পৃথিবীর নানা জায়গায় প্রাণী ছিল। এরা জন্মাচ্ছিল, বাড়ছিল, আবার একদিন মৃত্যুমুখে ধ্বংস হচ্ছিল; কিন্তু কেউই

একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল না। কেননা, বিশ্বে কিছুই নষ্ট হয় না; এক রূপ থেকে আর এক রূপে রূপান্তরিত হয় মাত্র। তাই অতীতের প্রাণীগুলোকে আমরা আর দেখ্‌তে পাই না, কিন্তু তাদের দেহাবশেষ এই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও—কোন না কোন অবস্থায় আছে। তাদের মধ্যে প্রায় সবই আবার পাথরে পরিণত হয়েছে।

এবার ডাঙার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌। যতদূর চোখ যায়, গভীর বন! এতকাল অহরহ ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত ও সেই সঙ্গে ধোঁয়া বার হবার ফলে, বাতাস বিষাক্ত ও কারবন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসে ভরে গেছে; অক্সিজেনের পরিমাণ তাতে অনেক কম। এমন আবহাওয়ায় প্রাণী বাঁচে না, কিন্তু উদ্ভিদের পক্ষে এ বাতাস বড়ই স্বাস্থ্যকর। আবার আকাশ সারাদিনই সজল মেঘাচ্ছন্ন, সূর্য্যের আলোক দেখা যায় না, প্রায় সারা দিনরাতই ঝর্‌-ঝর্‌ ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। তারই ফলে চারধারে ছোট-বড় অসংখ্য জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, নদীধারা দুকূল ভেঙে কাদার রাশি নিয়ে ছুটে চলেছে। তার জলেও মাটি সরস হচ্ছে। তাই যেদিকে তাকাও—জলা, আর ঘন বন।

ভাব্‌ছিস্‌ সময়টা ছিল তখন ঠাণ্ডা, দৃশ্যটি বড় মনোরম! তা বোধহয় নয়; বাতাস তখন এখনকার চেয়ে গরমই ছিল। তবে দৃশ্যটা মন্দ ছিল না।

ওদিকে বৃষ্টি ঝরছিল বটে, কিন্তু মাটি ও জলাশয়গুলো থেকে গরম বাষ্পও উঠ্‌ছিল আর সেই সঙ্গে চারধারের গাছগুলো পচে-গলে যে দুর্গন্ধ বার হচ্ছিল, তা কল্পনাতীত। এমন বনে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়ানো দুঃসাধ্য। এর শোভা দূর থেকেই ভাল।

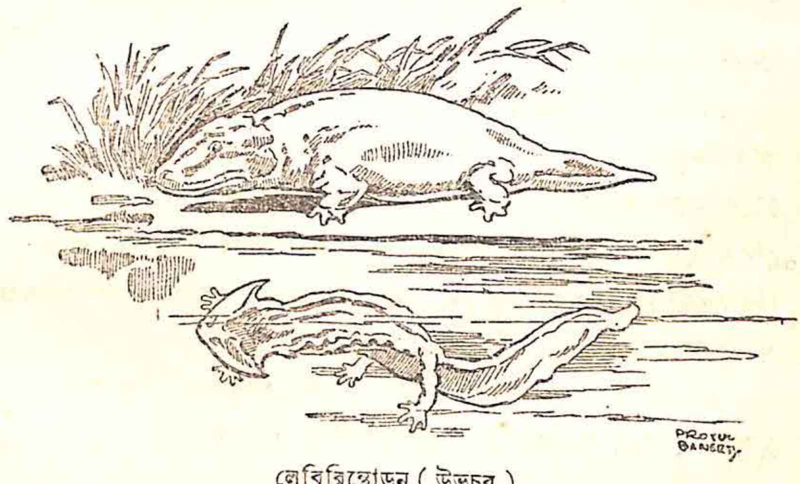
তোরা দেখেছিস্, বর্ষায় গাছপালা তাড়াতাড়ি বাড়ে; তখন তাদের চেহারা হয় বেশ সতেজ ও রসালো। কিন্তু তখনকার গাছপালা এর চেয়েও তাড়াতাড়ি বাড়ত; এর চেয়েও সেগুলো রসালো ও সতেজ ছিল। একালে সে-রকমের গাছপালা পৃথিবীর কোথাও দেখ্‌তে পাবি না, তেমন ঘন বনও কোথাও নেই। সব সময়ই তার তলা ভিজে ও অন্ধকার হয়ে থাকত। তার মাঝে মাঝে ছিল আবার ছোট-বড় জলাভূমি।

এ বনে গাছ ছিল—পাইন, ফার্ণ, ক্লাব-মস, ঘোড়া-লেজা, ঢেঁকীশাক, সাইকাড্। গাছগুলোর কোনটাই ত্রিশ-চল্লিশ হাতের কম হত না। সেই অনুসারে তাদের গুঁড়ি ছিল চার-পাঁচ হাত মোটা। সবগুলোই সরল, বেশ রসালো; একটু আঁচড়ালে বা ছেঁদা করতে গা দিয়ে ঝর্-ঝর্ করে রস ঝরে পড়ত; কিন্তু কোনটিতেই ফুল ফুট্‌ত না, ফল ধরত না।

এদেরই পায়ের গোড়ায় আবার ছিল ছোট ছোট গাছের ঘন ঝোপ-জঙ্গল। এখনকার মতোই গাছগুলো জন্মাত, বাড়ত, আবার একদিন মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। কখন কখন সমুদ্রের ধারের এক-একটা বিশাল বনকে বন হঠাৎ ধ্বসে যেত! আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র মহাগর্জ্জনে ছুটে এসে সমস্ত বনভূমিকে গ্রাস করে, পৃথিবীর বুক থেকে তার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেল্‌ত।

এমন বন, কিন্তু তাতে এখনকার মত কোন প্রাণী ছিল না। ছিল তার জলার ধারে ধারে উভচর প্রাণীর পূর্ব্বপুরুষ লেবিরিন্থোডন্; বড় বড় নিউট, তিন-চার হাত উঁচু ব্যাঙ্, বড় বড় মাছি—তার এক একটার পাখনার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো মাপলে হত পৌনে এক হাত বা পৌনে দু'হাত।

লেবিরিন্থোডন্‌গুলো আকারে হত প্রকাণ্ড। আজকালকার একটা টিকটিকিকে যদি বিশ-পঁচিশ হাত লম্বা আর সেই অনুপাতে মোটা করা যায়, তাহলে সেটাকে যেমন দেখ্‌তে লাগে, লেবিরিন্থোডন্‌গুলোও ছিল ঠিক সেই রকম দেখ্‌তে। এরা শিকারের সন্ধানে এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘুরে বেড়াত, ওৎ পেতে বনের আড়ালে চুপ করে বসে থাকত; শিকার দেখলেই তার ওপর লাফিয়ে পড়ত। আবার



লেবিরিন্থোডন্ (উভচর)

নিউটগুলো কাঠবেরালীর মত গাছে উঠতে পারত। এ ছাড়া, গুবরে পোকা, আরশুলা, ফড়িং ও পঙ্গপাল প্রভৃতি ছয়পাওয়ালা প্রাণীরাও সে সময়ে ছিল অনেক।

এদের গুঞ্জনে, মাঝে মাঝে জলার ধার থেকে বিশাল ব্যাং ও লেবিরিন্থোডন্‌গুলোর গম্ভীর ডাকে সেই ভয়াবহ বনের নিস্তব্ধতা সহসা ভঙ্গ হত। এরই সঙ্গে যোগ দিত বৃষ্টি-ধারার শব্দ, বজ্রের ধ্বনি

আর বাতাসের গর্জ্জন। সেই দুর্য্যোগে, সেই ভয়ানক জায়গায় কখন কখন দু-একটি প্রকাণ্ড সরীসৃপ হয়তো থেকে থেকে ডাক ছেড়ে খাদ্যান্বেষণে এধারে-ওধারে ঘুরে বেড়াত। কি বিশ্রী ছিল তাদের চেহারা! কি রকমের উজ্জ্বল তাদের চোখ দুটো! ঐ যে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি—একটা এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে কাদার ওপর দিয়ে থপ্ থপ্ করে চলেছে। কাদার ওপর তার এই পায়ের চিহ্ন বহু কোটি বছরের জন্য আঁকা হয়ে গেল। এ চিহ্ন আর মুছবে না।

সে বন আজ নেই; মাটির বহু নিচে বিলীন হয়েছে। কিন্তু তার কিছুই নষ্ট হয় নি। পৃথিবীর বহু লক্ষ বছরের তাপে, ওপরের চাপে আজ সে সবকে পাথুরে কয়লারূপে খনিতে পাই, এবং এর কোন কোন গাছকে পাথররূপে দেখি। আর যে কাদার ওপর দিয়ে সরীসৃপ হেঁটে গিয়েছিল সেই চিহ্নগুলি সমেত কাদারাশিও পাথর হয়ে গেছে।

তবে সেই সব গাছপালার মধ্যে কোন কোনটি আজও পৃথিবীতে বর্ত্তমান; কিন্তু আয়তনে, আকৃতিতে তারা আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে; এত ছোট যে, সে যুগের বলে সকলে তাদের চিন্‌তে পারবি না। আর আরশুলা, গুবরে পোকা, ফড়িং, পঙ্গপালদের তো তোরা দেখ্‌তেই পাস্। এরা পৃথিবীর অনেক পুরাণো প্রাণী। এদের কথা আগে বলেছি।

এই যুগের স্তরে কেবল যে পাথুরে কয়লা পাওয়া যায় তা নয়; লোহাও পাওয়া যায় প্রচুর। এ দুটি আমাদের নিত্য দরকারে লাগে। তাই নয় কি?”

ষষ্ঠ অধ্যায়

জলে স্থলে সরীসৃপ—বিরাট প্রাণীর যুগ

"তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যের পরও একটা দৃশ্য আছে ; কিন্তু সেটা কিছু অস্পষ্ট। সেই দৃশ্যেই পৃথিবীতে উভচর ও সরীসৃপ ছিল বলে মনে হয়।

অবশ্য সরীসৃপ আর উভচর প্রাণীর মধ্যে চেহারার তফাৎ খুব বেশি নেই। জলচর প্রাণী থেকে যেমন উভচর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি উভচর প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয়েছে সরীসৃপের।

তোরা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ জল থেকে কেমন আস্তে আস্তে প্রাণীরা ডাঙায় উঠে আস্‌ছে ?

সরীসৃপরা থাক্‌ত কেবল ডাঙায়। ডাঙাতেই তারা ডিম পাড়ত ; তার মধ্য থেকে বাচ্চা বেরিয়ে ডাঙাতেই বড় হত। তারপর গাছের ডাল-পালা খেয়ে তারা বনে বনে, সুবিশাল প্রান্তরে বা পর্ব্বতকোলে বিপুল শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলে-ফিরে বেড়াত।

উভচরেরাও ডাঙায় চলা-ফেরা ও শিকার করে বেড়াত বটে, কিন্তু ডিম পাড়বার সময় তারা জলে নেমে যেত। ডিমগুলো জলেরই কিনারে কোথাও পেড়ে রাখত। সেই ডিম ফুটে যে বাচ্চা বার হত, প্রথমে কিছুকাল তাকে জলে থাক্‌তে হত ; তারপর পূর্ণ শরীর ধরে ডাঙায় উঠে আস্‌ত—যেমন করে থাকে আজকালকার ব্যাং, নিউট, কোন কোন জাতের কচ্ছপ।

যে ঘন বন এর আগে তোরা দেখেছিলি, এ দৃশ্যে সে বন আর নেই। বাতাস এবার পরিষ্কার। বনের গাছ-পালা বাতাসের অনেক কারবন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস টেনে নিয়ে বাতাসকে নির্ম্মল ও প্রাণীদের শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার উপযুক্ত করেছে। তেমন গরমও আর বোধ হচ্ছে না ; বরং মাঝে মাঝে একটু শীত করে।

চারধারে তাকিয়ে দেখ্, একটা নতুন পৃথিবী। মাঝে মাঝে ছোট-বড় গাছ ; গাছগুলো আর তেমন সতেজ ও রসালো নয়, তাদের গুঁড়ি অপেক্ষাকৃত শক্ত—এদিকে-ওদিকে তৃণশূন্য শুষ্ক রুক্ষ সুবিশাল প্রান্তর। কেননা, ঘাস তখনও কোথায়ও দেখা দেয় নি। পাহাড়গুলোর মূর্ত্তিও রুক্ষ, কঠোর। তাদের গায়ে একটি গাছও নেই, কিন্তু প্রভাতে ও দিনান্তের সূর্য্যালোকে বিচিত্র রঙে তাদের চূড়া ও দেহ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। তাকিয়ে দেখ্, এই দৃশ্যের মাঝ দিয়ে চার-পাঁচটা কুৎসিত চেহারার অতিকায় সরীসৃপ ঐ যে দুপাশে তাকাতে তাকাতে খাদ্যান্বেষণে চলেছে! হয়তো তোদের পিছন দিকেও একটা চুপ করে দাঁড়িয়ে তোদের দেখছে! ঐ যে পাশের ঝোপটার মাথা ছাড়িয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার মুখ দেখা যাচ্ছে! কি বিশ্রী ওর চাহনী! সরীসৃপটা ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

মাঝে মাঝে এদের নিজেদের মধ্যে যখন লড়াই বাধে, কি ত্রিশ হাত লম্বা একটা উদ্ভিদ্‌ভোজী সরীসৃপকে যখন তার চেয়েও বড় মাংসাশী অতিকায় সরীসৃপ আক্রমণ করে, তখন এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড বেধে ওঠে। যেন দুটো পাহাড় ধাকাধাক্কি করছে!—তাদের চীৎকারে, আঘাতে, সদর্প চলা-ফেরায় মাটি ঘন-ঘন কাঁপতে থাকে। লড়াইয়ের পর চারধারের মাটি রক্তে কাদা হয়ে যায়।

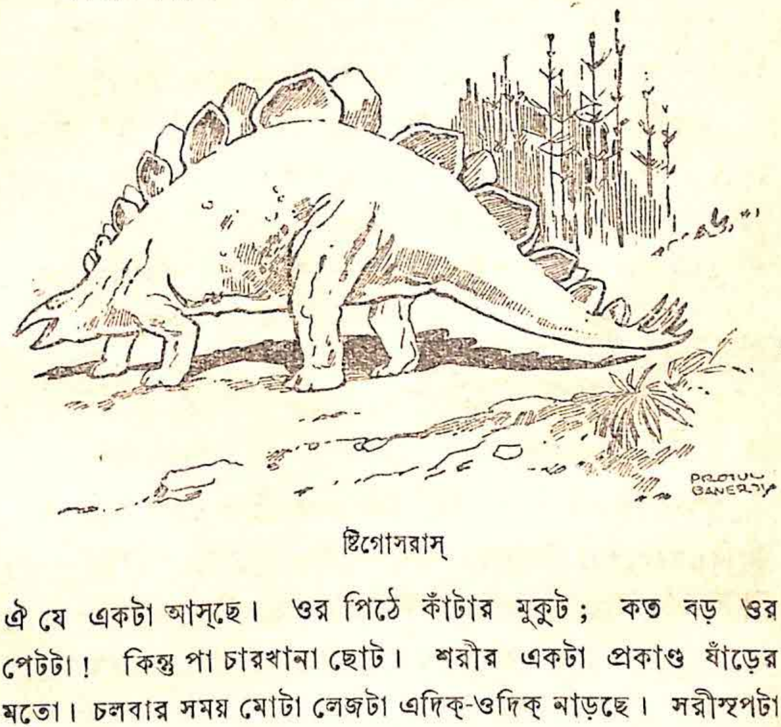
অতীতের পৃথিবী—



প্রস্তরীভূত পাতা

এ দৃশ্যেরও কোন গাছেই ফুল-ফল ছিল না। তবে একটা পরিবর্ত্তন এই হয়েছিল যে, বর্ষা ও গ্রীষ্মে বনের রং কিছু বদলে যেত। বর্ষায় হত সবুজ, গ্রীষ্মে হল্‌দে বা ধূসর। আর উঁচু জমিতে কোন গাছ-পালা ছিল না, যা কিছু ছিল সব নিচু জলা-জমিতে।

এইবার সরীসৃপগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখ্।



ষ্টিগোসরাস্

ঐ যে একটা আস্‌ছে। ওর পিঠে কাঁটার মুকুট; কত বড় ওর পেটটা! কিন্তু পা চারখানা ছোট। শরীর একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়ের মতো। চলবার সময় মোটা লেজটা এদিক্-ওদিক্ নাড়ছে। সরীসৃপটা আস্‌ছে আর মাঝে মাঝে অতি কর্কশ ডাক ছাড়ছে। ও কি চায়? খাবার। পশুজীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য খাদ্য। জন্তুটার নাম ষ্টিগোসরাস্। ওর খাদ্য উদ্ভিদ্। উনি হচ্ছেন ভবিষ্যৎকালের

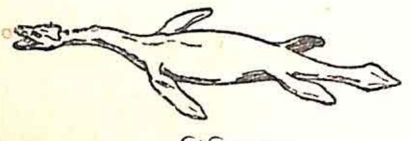
স্তন্যপায়াদের পূর্ব্বপুরুষ। ওঁদের জাতের নাম থেরিওমরফা রেপটাইলী।

ইনি এখন চার পায়ে ভর দিয়ে হেঁটে চলেছেন বটে; কিন্তু কিছুকাল পরে ওঁর জাতের কেউ কেউ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বড় বড় গাছের মাথা মুড়িয়ে খাবেন।"

একটি নাতনী সরে এসে ঠাকুরদার পাশ ঘেঁষে বসে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, ঐ এক রকমের সরীসৃপই কি তখন ছিল?"

ঠাকুরদা হেসে বল্‌লেন—"নাতনীর ভয় হয়েছে। তুই আমার গা ঘেঁষে বস্! ও তোকে কিছু বলবে না। ও এ-কালের এক রাজপুত্র, পরীর শাপে সেকালে হয়েছিল সরীসৃপ।

তখন পাঁচ জাতের সরীসৃপ ছিল—এক নম্বরের কথা তো শুন্‌লি,



প্লিসিওসরস্



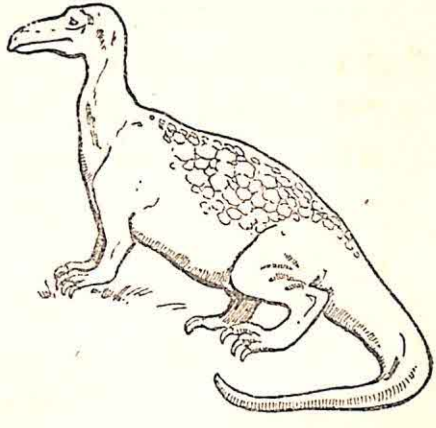
ইক্‌থিওসরস্

দু'নম্বরের নাম ডাইনোসর, তিন নম্বর প্লিসিওসরস্, চার নম্বর ইক্‌থিওসরস্, আর পাঁচ নম্বর টেরোডাকটিলস্। ডাইনোসর ছিল স্থলচর, প্লিসিওসরস্ আর ইক্‌থিওসরস্ জলচর, টেরোডাকটিলস্ ছিল খেচর; এরা ছাড়া আরও কত রকমের সরীসৃপ যে ছিল, তার হিসেব দেয় কে?

ডাইনোসরদের কথা শোন্। তখন ডাইনোসর ছিল অনেক রকমের। তারা ছিল যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, তেমনি ছিল তাদের গায়ে জোর। তাদের কাছে কোথায় লাগে হাতী! মুখখানা ছিল অতি বিশ্রী। তাদের ভয়ডর কিছু ছিল না; বন-জঙ্গল ভেঙে ভোঁস্ ভোঁস্

করতে করতে চলত। পণ্ডিতদের মতে, প্রথম জন্মে নিরামিষাশী ডাইনোসরেরা ; তাদের পরে আমিষাশীরা।

ঐ যে একটা আস্‌ছে —লাফাতে লাফাতে। ভয় নেই—ভয় নেই! বস্‌, বস্‌। সত্যই অতি ভয়ানক চেহারা! দেখ্‌লে ভয় পাবার কথা বটে। ওটার নাম ইগুয়ানোডন্‌।



ইগুয়ানোডন্‌

ইগুয়ানা কাকে বলে জানিস্‌? গোসাপ। জন্তুটা দেখতে কতকটা গোসাপের মতো নয় কি? ইগুয়ানোডন্‌টা বনের ধারে কাঙারুর মত বসে ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে-ওদিকে কি যেন দেখ্‌ছে! ওর ঠোঁট দেখ্‌লে মনে হয় কাছিম। ঐ যে পিছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ালো। তারপর সামনের দুটো হাত দিয়ে প্রায় বিশ হাত উঁচু ঢেঁকীশাকের কচি আগা ছিঁড়ে খাচ্ছে।

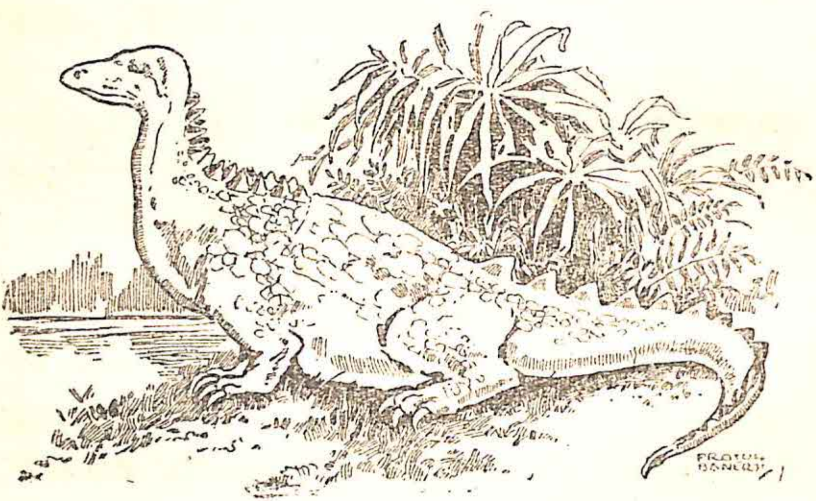
এবার বোধ হয় আমার কথা বুঝ্‌তে পারছিস্‌ যে, প্রাণধারণের জন্য আগে সৃষ্টি হয় প্রাণীর খাদ্য। এরা উদ্ভিদ্‌ভোজী, কিন্তু যখন বন সৃষ্টি হয়নি তখন এরা কি কেউ ছিল?

এটাকে দেখে একটা কথা মনে হল। তোরা হয়তো বিশ্বাস করবি না, কিন্তু না বলেও পারছি না। এরাই বোধহয় পাখীর পূর্ব্ব-পুরুষ। কেননা, পাখীর পায়ের সঙ্গে এদের পা ও নখের বেশ মিল।

প্রথম যুগের কোন কোন পাখী উড়তে পারত না; জলের ধারে মাছের আশায় চুপ করে বসে থাকৃত। মাছ দেখ্লেই জলে লাফিয়ে পড়ে ডুব-সাঁতার দিয়ে তাকে ঠোঁটে করে চেপে ধরত। তখন তাদের পা দুখানা করত দাঁড়ের কাজ।

তারপর দিনে দিনে তাদের পিঠে ডানা গজিয়েছিল।

অত বড় শরীর; কিন্তু প্রাণীদের স্বভাব বড় নিরীহ। ঐ যে



পোলাক্যানথসে (ডাইনোসর)

আরও দুটো। ছোটটা বোধহয় বাচ্চা। বাচ্চা হলেও গায়ে কি জোর! তালজাতীয় প্রকাণ্ড গাছটার মাথা স্বচ্ছন্দে ভেঙে ফেল্লে! অত বড় জন্তুর ডিম না জানি কত বড় হয়! সম্ভবতঃ লম্বায় আড়াই হাত, ব্যাসেও দু'হাত হবে।

ও কি! ওরা পালাচ্ছে কেন?

দূরে ঐ যে নদীর ধারে কি যেন দেখা যাচ্ছে! একটা ছোটখাট

মাংসের ঢিপি, হাতীর চেয়েও বড়। ঢিপিটা—না—না—ঢিপি নয়, মেগালোসরাস্! সেকালের এক রাক্ষস। এ-কালের বাঘ-সিংহের চেয়েও হিংস্র!

রাক্ষসটা কাঙারুর মত পিছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে আস্ছে, আর তীক্ষ্ণ লম্বা দাঁতের পাটি বার করে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করছে। ওর পদভরে মাটি কাঁপ্ছে; নখের আঘাতে চারধারে মাটি ছিট্কে পড়ছে।

ইগুয়ানোডন্গুলোও পালাচ্ছে। রাক্ষসটা বোধহয় ওদের ধরতে পারবে না। ওরা চারটেতেই বনের আড়ালে ঢাকা পড়ল। গাছগুলো এত ঘন ঘন নড়ছে কেন? ঐ যে আবার বনের মধ্য দিয়ে ছুটে আস্ছে।"

সকলে দেখল, মেগালোসরাস্টা লাফাতে লাফাতে এসে পিছনের পায়ে, ছোরার মতো নখ দিয়ে ইগুয়ানোডন্টার পেট চিরে ফেল্লে। বেচারার অত বড় শরীর; কিন্তু বিশেষ কিছু করতে পারলে না। এক গাদা নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। মেগালোসরাস্টা এবার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে তার গলা কামড়ে ধরলে। রক্ত—রক্ত—চারধারে ইগুয়ানোডন্টার তাজা গরম রক্ত! তুমুল ঝটা-পটি চল্ল। যদিও মেগালোসরাস্টা আকারে ইগুয়ানোডন্টার চেয়ে ছোট, তবুও বৃথা চেষ্টা। মিনিট-কয়েকের মধ্যেই ইগুয়ানোডন্টার প্রাণহীন বিশাল শরীর ভীষণ শব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

রাক্ষসটার কি আনন্দ! সে ইগুয়ানোডন্টার গা থেকে তাল তাল মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিলে খেতে আরম্ভ করলে।"—

আর এক নাত্নী জিজ্ঞাসা করলে—"ঠাকুরদা, এর চেয়েও বড় কোন রাক্ষস তখন ছিল কি?"

"ছিল বৈ কি! তার নাম টাইরানোসরাস্। এক একটা টাইরানোসরাস্ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত লম্বা হত। তারাও কাঙারুর মতো পিছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে ছুটত, আর শিকার ধরত সামনের ছোট দুটো পা বা হাত যাই বল, তার সাহায্যে।

তাদের এক একটার পিছনের পায়ের থাবা হত দু'হাত লম্বা! তারা উঁচু হত বারো-চৌদ্দ হাত। যখন পিছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে বস্ত তখন মনে হত একটা মাংসের পাহাড়।

সেরটোসরাস্ নামে তাদের এক জাতভাই ছিল; তারাও ভীষণ হিংস্র আর আমিষলোভী ছিল। কাঙারুর মতো দু'পায়ে ভর করে, লাফিয়ে লাফিয়ে শিকার ধর্‌তে এরাও ছিল ওস্তাদ।

ডাইনোসররা প্রায় সকলেই পিছনের পায়ে ভর দিয়ে চলা-ফেরা করত; তাদের সামনের পা দুখানা ছিল ছোট। সে দুটো তাদের হাতের কাজ করত। যারা মাংসাশী ছিল, তাদের দাঁত ছিল তীক্ষ্ণ ও বড়; পায়ে ছিল ধারালো বড় নখ। যারা উদ্ভিদ্‌ভোজী ছিল, তাদের কারো দাঁতের সারি ছিল না।

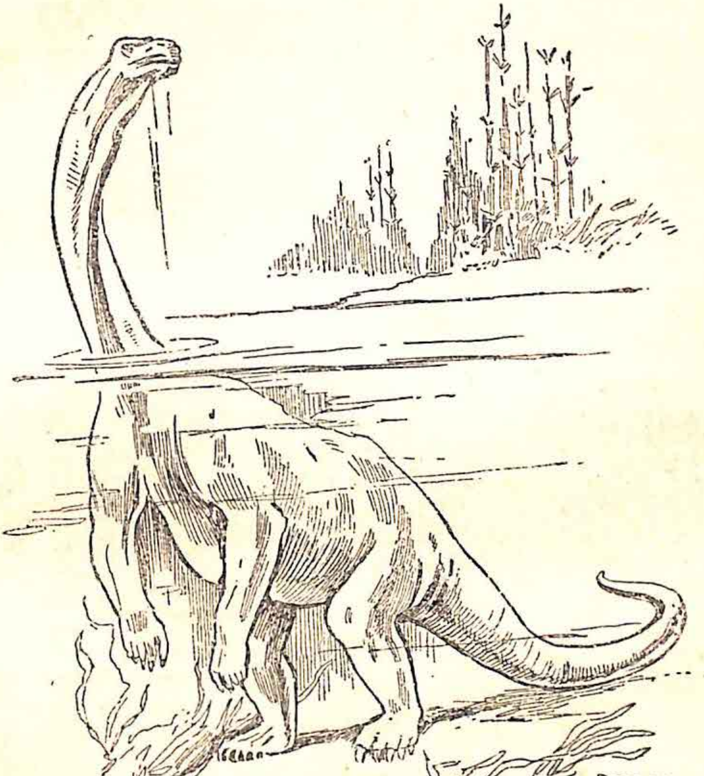
আবার তাদের চেয়েও বড় বোধহয়, ডাইনোসরদের মধ্যে সব চেয়ে বড়, এক রকমের ডাইনোসর ছিল। দেখ্‌বি তাদের? সামনের হ্রদটার দিকে তাকিয়ে দেখ্।"

অশোক বলে উঠ্‌ল—"ও! ওকি? একটা লম্বা গলা জলের মধ্য থেকে উঠ্‌ল। ওটা কি অজগর? সেকালের অজগর?"

ঠাকুরদা হেসে বল্‌লেন—"না। তখন সাপই ছিল না তো অজগর! ঐ দেখ্, ওটা উঠে আস্‌ছে।"

জন্তুটা আস্তে আস্তে জল থেকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। প্রথমে ছোট

মুখ, তারপর গলা, গলার কিছুক্ষণ পর শরীর, শরীরের কিছুক্ষণ পর মোটা লেজটা। জন্তুটা উঠ্‌ছে তো উঠ্‌ছেই। যখন ডাঙায় উঠে

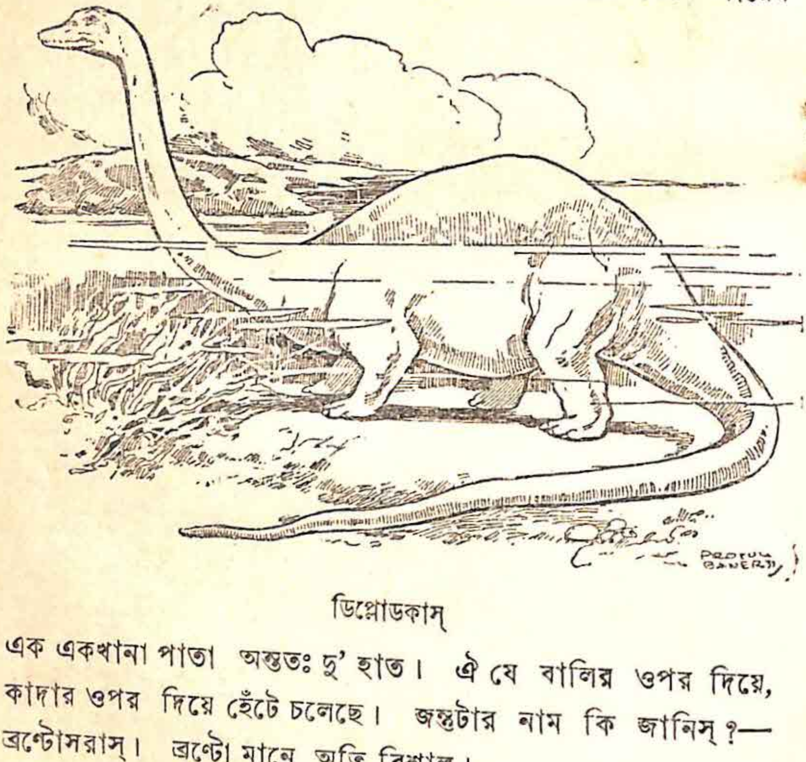


ব্রণ্টোসরাস্

দাঁড়াল, তখন দেখে মনে হল যেন সচল মাংসের পাহাড়! সারা শরীরটা লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ হাত হবে। পেটের বেড় হবে অন্ততঃ ত্রিশ

হাত। জন্তুটা ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। তারপর খুব আস্তে আস্তে কুৎসিত শরীরটা হ্রদের তীর ধরে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

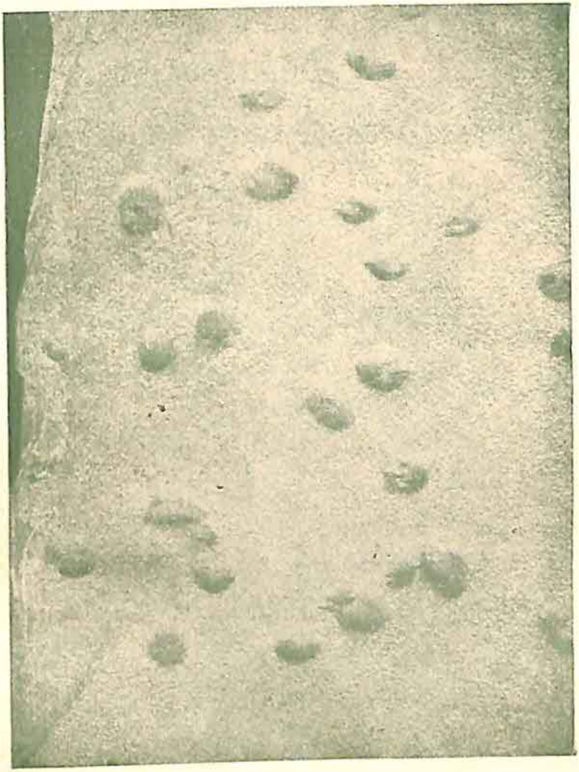
ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ওর শরীরের বিশেষত্ব দেখেছিস্? গলা আর লেজ ভয়ানক লম্বা। গলাটা অন্ততঃ পনেরো হাত হবে। ওরাও সরীসৃপ ; কিন্তু সামনের পা-দুখানা বেশি ছোট নয়। পায়ের



ডিপ্লোডকাস্

এক একখানা পাতা অন্ততঃ দু' হাত। ঐ যে বালির ওপর দিয়ে, কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। জন্তুটার নাম কি জানিস্?—ব্রণ্টোসরাস্। ব্রণ্টো মানে অতি বিশাল।

আবার ওর চেয়ে একটু ছোট আর এক রকমের ডাইনোসর আছে, নাম তার সিটিওসরাস্।



প্রস্তরীভূত বৃষ্টিপাতের দাগ

পৃষ্ঠা—৩৬

তারা সকলেই জলের ধারে চলা-ফেরা করত। ডাঙার ওপর দিয়ে এত বড় শরীরটা টেনে নিয়ে যাওয়া তো কম কথা নয়! জলে জিনিষের ভার কম হয়। এরা তাই জলে বেশ সহজে, স্বচ্ছন্দে চলত-ফিরত, লম্বা গলা ডুবিয়ে জলজ গাছপালা তুলে বা জলে দাঁড়িয়েই তীরের বন থেকে বনের গাছপালা ছিঁড়ে খেত।

ওদের এত বড় শরীর; গায়েও ভীষণ জোর, কিন্তু কোন টাইরানোসরাস বা মেগালোসরাসকে দেখ্‌লে ভয়ে কাঁপত। রাক্ষস-গুলোর তীক্ষ্ণধার দাঁত ও সুতীক্ষ্ণ নখের কাছে ওরা ছিল নিরুপায়। এই সব কারণে ওরা জল থেকে উঠত না। তবে এক এক সময় প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে যে ভয়ানক লড়াই করত, তা কল্পনাও করা যায় না। এমন মল্লযুদ্ধ কে দেখেছে?

সে-সময়ে কত গাছপালা ওদের দেহভারে ভেঙে উপড়ে যেত, কত জায়গার মাটি দেবে যেত, একবার ভাব দেখি?

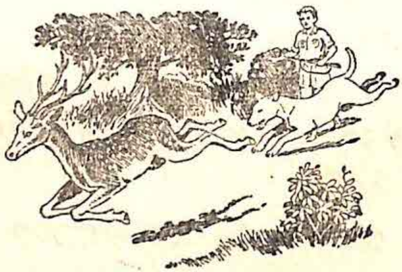
বনে বনে, হ্রদে, সমুদ্রকূলে তখন এই সব অতিকায়দের মেলা। কোন কোন হ্রদ ও নদীর কূল ব্রণ্টোসরাসদের চলাফেরায় তোলপাড় হয়ে উঠ্‌ত।

আবার ওদের চেয়েও প্রকাণ্ড ছিল ডিপ্লোডকাস্‌; কিন্তু তাদের শরীরের মধ্যে সার ছিল, লেজ আর গলা। লেজের আগা থেকে নাকের আগা অবধি মাপলে হত অন্ততঃ ষাট হাত। লেজ-গলা বড় হলেও তাদের পেটটাও কম ছিল না;—চারটে রেলের ইঞ্জিনের বয়লার পাশাপাশি ও ওপর-নীচে জোড়া দিলে যা হত, তাদের পেট ছিল তার চেয়েও মোটা। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজকালকার

যে-কোন একটা তাল বা নারিকেল গাছের মাথা থেকে স্বচ্ছন্দে পাতা ছিঁড়ে খেতে পারত।

শরীরটা প্রকাণ্ড হলেও কারো কান ছিল না, চোখ দুটোও ছিল নিতান্ত ছোট, মুখও বড় নয়, বুদ্ধিও ছিল কম।

একদিন তারাই ছিল সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী। বলে, বীর্য্যে, বিক্রমে তারা কম ছিল না। কোনদিন তাদের কারো খাদ্যেরও অভাব হয় নি; তবুও আজ আর তাদের কেউ কোথায়ও নেই—ধরাতল থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে।"



সপ্তম অধ্যায়

ডাইনোসরের যুগে—পাখীর পূর্ব্বপুরুষ

ঠাকুরদা বলে যেতে লাগ্‌লেন—"এ পর্য্যন্ত যাদের দেখ্‌লি তাদের সকলেরই চেহারা কদাকার; দেখ্‌লে ভয়ের চেয়ে ঘৃণাই হয় বেশি। কেন যে এরা সুশ্রী ছিল না, তা জানি না। সে যুগটাই ছিল কুৎসিত সরীসৃপের যুগ।

তখনকার বনপ্রদেশে ওদের চেয়েও কুৎসিত আরও কয়েকটা অতিকায় প্রাণী বসবাস করত। তাদের একটার নাম ট্রাইসিরেটপ্‌স্, আর একটা ষ্টেগোসরাস্। তারা ছিল বর্ম্মধারী।

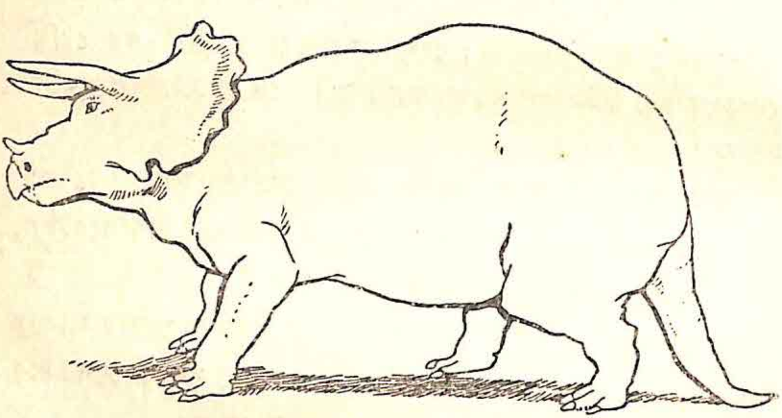
এগুলো কি জানিস্? গোসাপ। এই গোসাপগুলোর আকার ছিল হাতীর মতো। বনের মধ্য দিয়ে এরা যখন সদর্পে চলে-ফিরে বেড়াত, তখন দেখ্‌লে কে না বল্‌বে যে, হাতী চলেছে!

ষ্টেগোসরাসের পিঠে ছিল লম্বা কাঁটার সার। লেজও ছিল কতকগুলো লম্বা কাঁটা দিয়ে তৈরী; আর সারা গা ছিল আঁশের মতো শক্ত চক্রে ঢাকা যেন বর্ম্ম। রীতিমতো যোদ্ধার মূর্ত্তি আর কি! সাহস করে কেউ তাদের কাছে এগোত না। তারাও ডিম পাড়ত। সে তো লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার কথা; কিন্তু কিছুকাল আগেও ষ্টেগোসরাসের একটি আস্ত ডিম পাওয়া গেছে। অবশ্য সে ডিমে ডিমত্ব আর কিছু নেই; পাথরের ডিম বল্‌লেই চলে। ষ্টেগোসরাস

দেখিস্ নি? এর আগে অনেক ছবি দেখেছিস্। যার সঙ্গে এই বর্ণনাটা মিলে যায়, সেটাই স্টেগোসরাস।

ভাগ্যে এমন গোসাপ আজকাল গাঁয়ের ঝোপে-ঝাপে, ডোবার ধারে, বাঁশবনে দেখা যায় না!

এবার ট্রাইসিরেটপ্সের কথা শোন্। এটাও গোসাপ, কিন্তু চেহারা দেখ্লে, কে না বলবে যে গণ্ডার! মাথায় তিনটে



ট্রাইসিরেটপ্স্

শিঙ্; পা চারখানা মোটা, লেজটাও মোটা। ঘাড়ের কাছে যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মেম-সাহেবদের মতো শক্ত চামড়ার বিব। তাদেরও গায়ে চক্র ছিল।

তারা হাতীর মতো শরীর নিয়ে বনের পথে পথে খাবারের সন্ধানে ঘুড়ে বেড়াত। মাঝে মাঝে মধ্যপ্রাণিযুগের পক্ষিহীন ভয়াবহ নিস্তব্ধ বন তাদের বিকট ডাকে চমকিত হয়ে উঠত।

তারা সকলেই ছিল উদ্ভিদ্‌ভোজী। যারা উদ্ভিদ্‌ভোজী, তারা যে সব রকম উদ্ভিদ্ খায় না, একথা তোরা সকলেই জানিস্; কিন্তু কোন্ কোন্ উদ্ভিদ্ যে তারা খেত, তা বল্‌তে পারি না।

তাদেরই পাশাপাশি আর এক রকম গোসাপ ছিল। তাদের স্বভাব ছিল বড় ভয়ঙ্কর। তাদের মুখে ছিল সিংহের দাঁতের মতো দাঁতের পাটি; চেহারাটা ছিল বিশ্রী, স্বভাব ভয়ানক হিংস্র। চারখানা পায়ে ছিল ধারালো নখ। তারা চট্‌পট্ করে চলত; শিকার দেখলেই তার ওপর লাফিয়ে পড়ে শরীরটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করতো। তাদের ঝোঁক ছিল নিজেদের স্বজাতীয় উদ্ভিদ্‌ভোজী যারা, তাদের বধ করা। তাদেরই রক্ত-মাংস ছিল তাদের প্রিয় খাদ্য। তাদের বলা উচিত সিংহদন্তী।

তাদেরই অত্যাচারে সে-যুগের নিরামিষাশী ডাইনোসর এবং গোসাপের বংশ নির্ম্মূল হয়েছে। কিন্তু স্বজাতীয়দের হত্যা করে তারাও যে সুখে-স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর বনে বনে, পর্ব্বতগুহায় বংশবিস্তার করতে পেরেছে, তা নয়।

উদ্ভিদ্‌ভোজী অতিকায় গোসাপ আজ পৃথিবীর কোথায়ও নেই বটে, কিন্তু ঐ সঙ্গে তাদের শত্রু সিংহদন্তী গোসাপকেও পৃথিবীর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যা আছে তা কঙ্কাল; তাও আবার পাথর হয়ে পৃথিবীর অন্তরে লুকিয়ে থেকে স্বজাতি-হত্যার লজ্জা গোপন করছে।

এই তো দেখ্‌লি, ডাঙার অবস্থা! তৃণশূন্য সীমাহীন প্রান্তর; বৃক্ষ-লতাশূন্য মরুপর্ব্বতমালা, মাঝে মাঝে নদী, হ্রদ,—তার কূলে কূলে ঘন বন। সে-যুগে আর এক রকমের অতিকায় সরীসৃপ ছিল;

নাম তার কটিলোসরাস। এখনও আর এক রকমের সরীসৃপ দেখিস্ নি। সে প্রাণীটা বড় অদ্ভুত।



কটিলোসরাস

এসবের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যা, যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় বনের মধ্যে বা প্রান্তরে বাতাসের হু হু শব্দ, আর একটা চাপা গর্জ্জন কানে আস্‌বে। আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে বনের বাইরে কি প্রান্তর-শেষে দেখ্‌বি নীল মহাসমুদ্র বিশাল ঢেউ তুলে গর্জ্জন করছে। তার তীরে বা জলে কোন নৌকো নেই—এক মহাশূন্যতা।

যতটা পথ পার হয়ে এলি, তার মধ্যে কত রকমের অতিকায় সরীসৃপ চোখে পড়ল।

এবার ফিরে চল্। সামনে ঐ বন—ভয় নেই, আমি সঙ্গে আছি, হাতে কমণ্ডলুতে মন্ত্রপড়া জল আছে। কোন সরীসৃপ তোদের তাড়া করলেই জলের ছিটে দিয়ে তাদের মানুষ করে দেব।”

ঠাকুরদার সঙ্গে নাতি-নাতনীরাও মনে মনে বনে ঢুক্‌ল। কারো মুখে কথা নেই, বনও নিস্তব্ধ। কোথায়ও একটি পাখী ডাকছে না, একটি ছোট পাতাও খসে পড়ছে না। একালের বন যেমন একদিন পাতাশূন্য শীর্ণ হয়ে যায়, আবার একদিন নতুন পাতায়, ফুলমঞ্জরীতে ও ফলে ভরে ওঠে, সেকালের বন তেমন ছিল না; এমন শুক্‌নো পাতায়ও সে-বনের তলা ভরা থাক্‌ত না। কেবল আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আগের যুগের বনের মতোই কখন হত গাঢ় সবুজ, কখন হল্‌দে বা ধূসর।

সকলে চলেছে। হঠাৎ দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এসে বনের মাঝে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল।

কিসের শব্দ? ঐ যে আবার! যেন কি একটা জন্তু ডাকছে! তারপর এক মিনিট কাটল না, গাছের ডালপালা কাঁপিয়ে, পাখা ঝাপটে সামনে কিছুদূরে একটা গাছ থেকে কি যেন উড়ে গেল, সেটা যেতে না যেতে কি যেন উড়ে এসে বস্‌ল! ঐ যে, ঐ গাছের মাথাটা দুলছে।

সকলের কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো! শব্দটা বড় বিশ্রী। কি ওটা?

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ওগুলো কি জানিস্? টেরোডাক্‌টিল্। ওরই কথা বলছিলাম। দাঁড়াস্‌নি, চল্। এখনই দু'চারটে দেখ্‌তে পাবি।"

ঠাকুরদার কথা শেষ হতে না হতে চারটে টেরোডাক্‌টিল্ লম্বা গলা বার করে, আকাশে বিশাল ডানা ছড়িয়ে, সোঁ সোঁ শব্দে উড়ে চলে গেল।

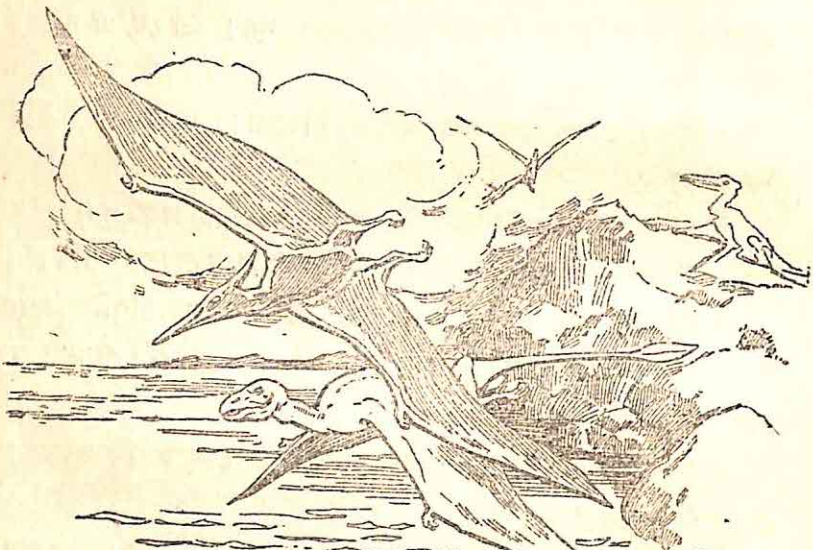
নাতি-নাতনীরা বল্‌লে—"এতবড় পাখী! দেখ্‌তে কি ভয়ঙ্কর! ঐ যে হাঁ করলে!"

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"পাখী নয়। ওগুলোও সরীসৃপ। বহুলক্ষ বছরের চেষ্টার ফলে এক শ্রেণীর বৃক্ষবাসী সরীসৃপ আকাশে উড়তে শিখেছে।

প্রথমে এরা এমন ডানা নাড়তে পারত না, চিল-শকুনের মতো ডানা মেলে আকাশে ভেসে যেত। ওদের গায়ে বা ডানায় লোম নেই। চোয়াল দু'খানার ওপর-নিচে আছে ছোট ছোট ধারালো দাঁতের সারি। লেজটা দেখেছিস্ কত বড়? ঠিক যেন একখানা মোটা

চাবুক! লেজের শেষে সড়কির চওড়া ফলার মতো একতাল মাংস! চেহারাটা প্রায় চামচিকে বা বাদুড়ের মতো নয় কি? কিন্তু বাদুড় গাছে ঝুলে থাকে, কোথায়ও সোজা হয়ে বসতে পারে না!

এরা সে রকমের নয়, মাটিতে বসতে পারে, তবে পাখীর মতো চল্‌তে পারে না। কাঠঠোক্‌রা বা বসন্ত-বউরী পাখী যেমন গাছের



টেরোডাক্‌টিল্‌ ও টেরানোডন

খাড়া গুঁড়িতে নখ লাগিয়ে বসে, এরাও তেমনি ভাবে বসতে পারে; আর, অমনি ভাবেই গাছের গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

সব টেরোডাক্‌টিল্‌ই যে এত বড় হয়, তা নয়; কাকের মতো ছোট ছোট টেরোডাক্‌টিল্‌ও আছে। ঐ বনের মাথার দিকে তাকিয়ে



একটি সরীসৃপের প্রস্তরীভূত পদচিহ্ন

পৃষ্ঠা—৩৬

দেখ্! ঐ যে কয়েকটা ছোট ছোট টেরোডাক্‌টিল্ লম্বা গলা বাড়িয়ে আকাশ-পথে উড়ে যাচ্ছে—যেন বকের সারি!

টেরোডাক্‌টিল্‌দের খাদ্য হল মাংস। ঐ ধারালো দাঁত দিয়ে, কি সুতীক্ষ্ণ নখওয়ালা হাতে ওরা শিকার চেপে ধরে। ওদের দিন-রাত জ্ঞান নেই। রাতের অন্ধকার আকাশকে আরও অন্ধকার করে এই রাক্ষসগুলো শিকারের সন্ধানে বনে বনে উড়ে বেড়ায়।

এরা কেবল যে বনেই থাকে তাও নয়—পাহাড়ে, পর্ব্বতে, বনে, সমুদ্রে, হ্রদে বা নদীর ধারেও এদের নিশিদিন দেখ্‌তে পাবি। শিকার দেখলেই এরা তার পিছনে ধাওয়া করবে। এদের ক্রুদ্ধ বিকট চীৎকারে, বিশাল ডানার শব্দে, এই মধ্যপ্রাণিযুগের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে। তবে একদিকে রক্ষা যে, সব টেরোডাক্‌টিলের দাঁত নেই।

টেরোডাক্‌টিল্ আবার লক্ষ লক্ষ বছরের শেষে হয়ে দাঁড়িয়েছে—টেরানোডন। এদের চেহারা আরও ভয়ঙ্কর, লেজ নেই, ঠোঁট সরু ও লম্বা, হাত দু'খানা ডানায় জোড়া, স্বভাবও হিংস্র। টেরানোডনগুলো লম্বায় বারো-চৌদ্দো হাত; যখন ডানা মেলে উড়ে যায়, তখন মনে হয় একখানা ছোট এরোপ্লেন উড়ছে।

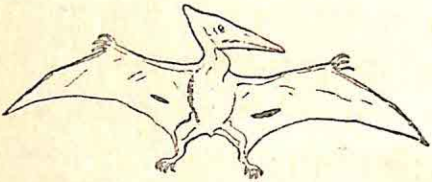
মনে হয়, সে-যুগে এরা ছাড়াও আরও অনেক সরীসৃপ উড়তে পারত; কিন্তু এখন আর কারোই কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সব অতল কালসাগরে ডুবে গেছে।

কি করে সরীসৃপরা উড়তে শিখল জানিস্?

যে-সব সরীসৃপ গাছে বাস করত, তারা এ-ডাল থেকে ও-ডালে, শিকার ধরবার কালে বা আত্মরক্ষার জন্যে এ-গাছ থেকে সে-গাছে

ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারই ফলে লক্ষ লক্ষ বছরে তাদের শরীরের পরিবর্তন হল ও দু'পাশে ঐ রকম ডানা গজাল।

কথাটা শুনে তোরা হাসছিস্; কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লে এতে অবিশ্বাসের কিছু পাবি না।



টেরানোডন্

আজকাল যেমন মানুষ সমস্ত পৃথিবীটাকে নানা ভাবে ভোগ করছে, মাটি খুঁড়ে হাজার দু'হাজার ফুট নিচে নেমে যাচ্ছে, আকাশের সর্ব্বত্র এরোপ্লেনে উড়ে বেড়াচ্ছে, জাহাজে সমুদ্র ও বড় বড় নদী পারাপার করছে—সেই যুগেও তেমনি পৃথিবীর অধিকারী ছিল, সরীসৃপেরা।

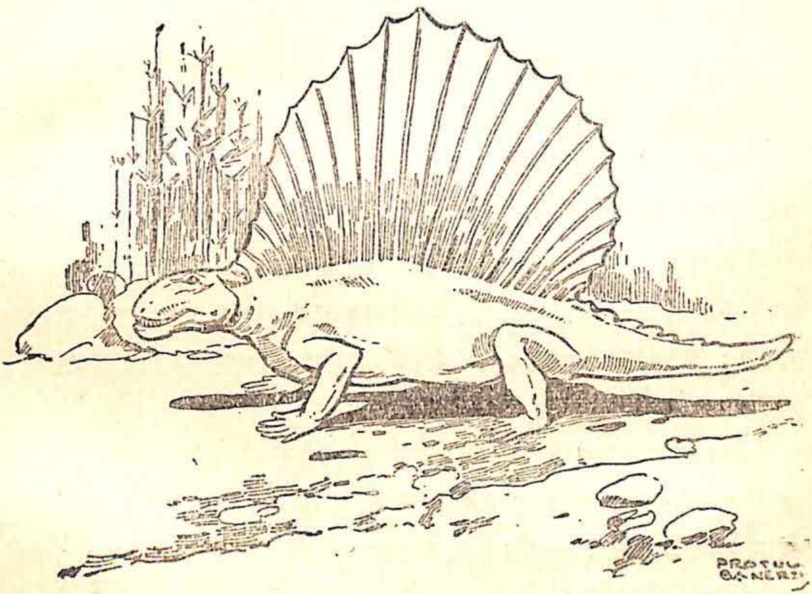
ডাঙা ও শূন্যের খবর তোরা শুনলি। বহু দেশ তো বেড়ানো হল; এবার চল্ সমুদ্রতীরে।" বলেই ঠাকুরদা সকলকে নিয়ে সে-কালের সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালেন।

সামনে নীল মহাসমুদ্র গর্জ্জন করছে। রৌদ্রে ও মেঘের ছায়ায় এই মহানীলের রঙ থেকে থেকে বদ্‌লে যাচ্ছে।

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"তোরা আগে প্লিসিওসরস আর ইকথিও-সরাসের নাম শুনেছিস্। ঐ দেখ্, সামনে জলের ভেতর থেকে অজগরের মতো গলা বাড়িয়েছে প্লিসিওসরস। ওরা জলেই থাকে, কিন্তু এতকাল ওরা ডাঙাতেই থাক্‌ত। কেবল আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের ফলে প্রাণধারণের জন্যে সমুদ্রের জলে নেমেছিল। সেই থেকে ওখানেই আছে।

ওদের মাছের মতো ডানা আছে, লেজও আছে। তবে তা ঠিক মাছের মতো নয়। তার সাহায্যে ওরা সাঁতারও কাটে না।

ওই যে ইক্‌থিওসরাসটা এই দিকেই আসছে। সরে দাঁড়া—আরো সরে যা। ওরা রাক্ষসবিশেষ। ঐখান থেকে হঠাৎ গলা বাড়িয়ে তোদের কাউকে হয়তো ধরবে।



ডাইমেট্রোডন (এক জাতের নিরামিষাশী ছোট ডাইনোসর)

সমুদ্রের ধারে যেখানে পাহাড় বা বন, এরা সেখানেই জলে বাস করে। ডাঙায় বা বনে কোন ছোট প্রাণী থাকলে এরা জল থেকে সাপের মতো গলা বাড়িয়ে খপ্ করে তাকে চেপে ধরে। এদের খাদ্য হল—কাটলমাছ, এমোনাইট শামুক, নানা রকমের মাছ ; কিন্তু ক্ষিদের

সময় এদের আপন-পর জ্ঞান থাকে না, নিজেদের ছানাগুলোকেও গিলে খায়।

ঐ দেখ্, ইক্‌থিওসরাসটা একটা ছোট টেরোডাক্‌টিল্‌কে ধরেছে। টেরোডাক্‌টিল্‌টা পাথরের ওপর বসেছিল। এখন পালাবার কত রকমের চেষ্টা করছে! কিন্তু ও রাক্ষসের মুখ থেকে কি আর নিস্তার আছে? ঐ যে জলের নিচে টেনে নিলে!

তোরা ভাবছিস্, ওরা যখন জলচর, তখন নিশ্চয়ই ওদের গায়ে আঁশ আছে। তা নেই, ওরা মাছের মতো বেশি জলেও যেতে পারে না, কূলের কাছে কাছে থাকে; এবং ডানার সাহায্যে সময় সময় জলের ওপর ভেসে বেড়াতে হয়। তখন মনে হয় একটি ছোট সচল দ্বীপ।

চেহারা অদ্ভুত হলেও ইক্‌থিওসরাসগুলো কিন্তু দেখ্‌তে মাছের মতো; আকারে প্রকাণ্ড। এদের চেহারা দেখ্‌লে সহজে বুঝতেই পারবি না যে, মাছ নয়, ওরা সরীসৃপ।

এখনকার তে-চোখো মাছ তোরা সকলে দেখেছিস্। মাছগুলোর মাথার মাঝখানে একটা চোখের মত দাগ থাকে কিন্তু সেটা দাগমাত্র। ইক্‌থিওসরাসদেরও দুটো চোখ তো ছিলই, মাথার ওপরও ছিল সত্যকারের একটা চোখ। তবে সেটা দিয়ে এরা দেখাশুনা করতো না বলেই মনে হয়। কেন না, চোখটা ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন। তবে রাগের সময় তা দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বার হত কি না, জানি না।

এদেরও স্বভাব ছিল রাক্ষুসে। এরা সরীসৃপ হলেও ডিম পাড়ত না, এদের একেবারে ছানা হত—অবশ্য জলেই।

এরা যখন ছিল, তখন সমুদ্রে বড় বড় কাছিমের অভাব ছিল না। কোথায় লাগে তার কাছে আজকালকার কাছিম? সমুদ্রের মাঝে প্রকাণ্ড বয়ার মতো তারা ভাসত। তাদের গলা ছিল ভয়ানক মোটা। তারা ছাড়া, তখন আরও কত রকমের জলচর সরীসৃপ ছিল!"

অষ্টম অধ্যায়

পাখীর ক্রম-বিকাশ

"মধ্যপ্রাণিযুগের বা তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য। এ-যুগের পাখী ছিল সবার চেয়ে উন্নত প্রাণী ; তবে বলে, বিক্রমে বা আকৃতিতে নয়, ডাঙায় ও আকাশে অবাধ গতির দরুণ।"

অশোক জিজ্ঞাসা করলে—"ঠাকুরদা, পাখী এল কোথা থেকে ?"

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ভাই, ঠিক কারণ বলা হয়তো যাবে না। তবে অবস্থা দেখে মনে হয় ইগুয়ানাডনেরই বংশ কালক্রমে পাখীতে পরিণত হয়েছিল। তবে টেরোডাক্‌টিল বা টেরানোডন্‌ থেকে যে পাখী হয় নি, এটা ঠিক। কেন যে একথা বল্‌ছি, এখনই বুঝ্‌তে পারবি। সকলে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌—এই বন পার হয়ে ঐ যে সেকালের বন দেখা যাচ্ছে।"

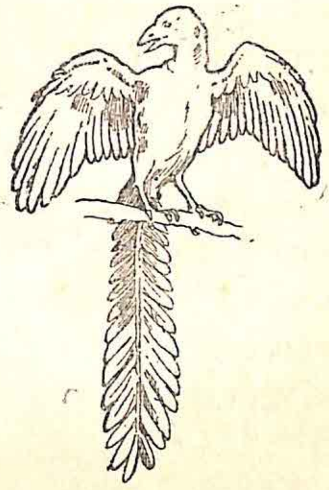
সকলে দেখলে, সামনে সেকালের ঘন বন।

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ঐ যে সেকালের পাখী। ওর নাম আরকিওপটেরিকস্‌। ওরাই পৃথিবীর আদিমতম পাখী।"

"ওগুলো পাখী না বাদুড় ? পাখী কি গাছের ডালে ঝোলে ?"

"ভাল করে তাকিয়ে দেখ্‌। ওদের সবগুলো ঝুল্‌ছে না, কতকগুলো ঝুল্‌ছে। কিন্তু ঝুল্‌তে পারে সকলেই। সকলেরই ডানার দু'ধারে তিনটে করে বাঁকানো আঙুল আছে।"

ঠাকুরদার কথায় এবার সকলে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল—তাঁর কথাই ঠিক। পাখীগুলো উড়ছে; গাছের তলায় বা ডালে বস্‌ছে; আবার ডাল থেকে ঝুল্‌ছে। সেই সময় এক একবার ডাক ছাড়ছে। কি কর্কশ স্বর! তাদের চেহারাও কিম্ভূতকিমাকার। কারো ঠোঁট নেই, সরীসৃপের মতো চোয়াল, তাতে ছোট ছোট তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি, লেজটা লম্বা, দু'পাশে খেজুরপাতার মতো সাজানো ঘন পালক। যদি এদের গায়ে পালক না থাকত, তবে দেখে কে বল্‌বে যে পাখী? আদিমতম যুগের হলেও পাখীগুলো কিন্তু আকারে পায়রার চেয়ে বড় নয়। আর টেরোডাক্‌টিল্‌দের সঙ্গেও এদের মিল নেই।

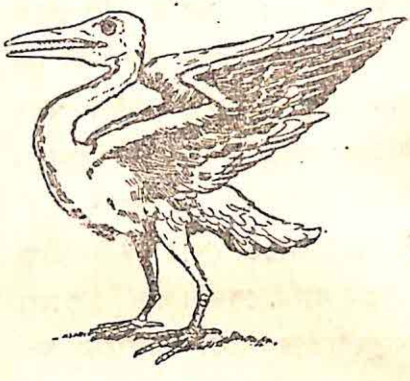


আর্কিওপটেরিকস্

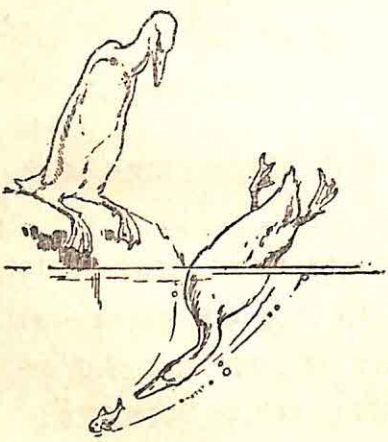
ঠাকুরদা বল্‌লেন—"হঠাৎ এদের ডাক শুন্‌লে বুঝতেই পারবি না যে, পাখী ডাক্‌ছে! ঐ আদিম বনে আর এক রকমের পাখী আছে, তার নাম ইক্‌থিয়ার্ণিস। এরাও ছোট, তবে এদের ঠোঁট কিছু লম্বা; কিন্তু তাতেও তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। এরা বেশ উড়তে পারে। এবার চল্‌ জলাশয়ের ধারে।"

তারা বন ছাড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা হ্রদের ধারে গিয়ে পড়ল। সকলের মনে হতে লাগল কোথায় যেন হাঁস ডাকছে!

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"শুন্‌তে পাচ্ছিস্? হেস্‌পারোরনিজ্ ডাক্‌ছে! ঐ দেখ্ সামনে জলার ধারে পাথরের ওপর কয়েকটা হেস্‌পারোরনিজ্ পাখী বসে। ওদের ডানা দু'খানা খুবই ছোট, সেই জন্যে উড়তে পারে না, জলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে, আশা—কখন মাছ ওঠে! স্বচ্ছ জল; নিচে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। মাছের একটু সন্ধান পেলেই ঝপ্ করে জলে লাফিয়ে পড়ে।



ইক্‌থিয়ার্ণিস



হেস্‌পারোরনিজ্

পাখী এককালের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রাণী হলেও সংখ্যায় ও রকমে কিন্তু অনেক কম; তবে সারা পৃথিবীর বনে-পর্ব্বতে, নদী ও সমুদ্রের ধারে বেড়ালে হয়তো আরও দু'চার রকমের পাখী দেখা যেতে পারে, যারা আকাশে উড়ে বেড়ায়।"

একজন নাত্‌নী জিজ্ঞাসা করল—"ঠাকুরদা, একালের উট পাখীর মতো কোন পাখী তখন ছিল না?"

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ছিল, ছিল, তার নাম মোয়া। টেরোডাক্‌টিল



সেকালের বন (কাল্পনিক দৃশ্য)

পৃষ্ঠা—৩২

দের অনেক পরে এরা পৃথিবীতে এসেছিল। আর্কিয়প্টেরিক্স, ইকফিয়র্নিস্ প্রভৃতিরও বহুকাল পরে এরা জন্মে। কোথায় লাগে এদের কাছে উট পাখী ? এরা ডিম পাড়ত প্রকাণ্ড। এক একটা লম্বায় হত দু'হাত। আরব্য উপন্যাসে সিন্ধুবাদ নাবিকের গল্প পড়েছিস্ ? সিন্ধুবাদ সেই যে রক পাখীর পায়ে নিজেকে বেঁধেছিল, মোয়া পাখী-গুলো সেই রক পাখীরই মতো বড় হত। তাদের পা দুখানাই হত ছোটখাট কলাগাছের মত মোটা। সিন্ধুবাদের রক পাখী উড়তে পারত ; তাদের ডানা ছিল ; কিন্তু এদের ডানা ছিল না, উড়বে কি দিয়ে ? তবে এরা মাটির ওপরে ঘোড়ার মত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে যেত। এদের বংশধর হল, আজকালকার উটপাখী, কেসোয়ারি, এমু প্রভৃতি।

এরা ছাড়া আরও কত রকমের পাখী ছিল যারা উড়তে পারত না—তাদের নাম ডোডো, অক, ডায়াট্রিমা।

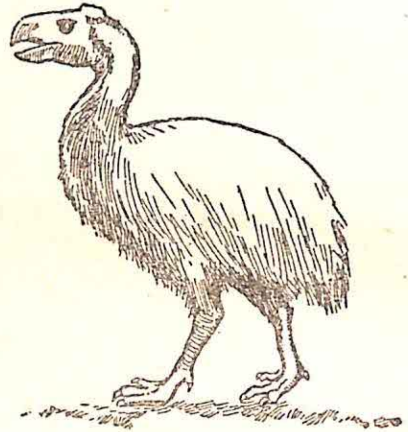
ডোডো ৪।৫ শ' বছর আগেও পৃথিবীতে ছিল। বড় নিরীহ পাখী ; উড়তে পারত না, কারো কোন ক্ষতিও করে নি। কোন কোন দ্বীপে সমুদ্রের ধারে বাস করত, আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে যে-সব শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি ডাঙায় এসে পড়ত, তাই খেয়ে প্রাণ বাঁচাত। কিন্তু রাক্ষুসে নাবিকদের শিকারের ঠেলায় আজ এরা নির্ব্বংশ। অক পাখী ডোডোর কিছুকাল আগে লোপ পেয়েছে।

সে-যুগে এদের কত শত্রু ছিল ! কত অবস্থা-বিপর্য্যয়ে এদের পড়তে হত ; কিন্তু সে-সব থেকেও আত্মরক্ষা করে এরা চারধারে বংশবিস্তার করে চলেছিল।

দেখ্‌লি, মধ্যপ্রাণিযুগের নানা দৃশ্যে কত রকমের ভীষণ প্রাণীর মেলা ! জলে, ডাঙায়, আকাশে সর্ব্বত্রই সরীসৃপ,—

সাঁতার দিচ্ছে, দৌড়চ্ছে; কিন্তু সহসা এ দৃশ্যের ওপর এক জায়গায় এসে যবনিকাপাত হল।

সে-সব অভিনেতারা পরের যুগের কোন দৃশ্যেই আর ফিরে এল না। কোথায় গেল সেই অতিকায় সরীসৃপেরা, কোথায় বা গেল সেই টেরোডাক্‌টিল্, কোথায় সেই প্লিসিওসরাসেরা? এমন কি, সমুদ্রে সেই যে এমোনাইটরা ছিল, যাদের শামুকের মতো চেহারা,— তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শেষ দৃশ্যে এদের বংশ এত বিস্তৃত হয়েছিল, আকার এত বড় হয়েছিল যে কি বল্‌ব! তবুও এরা থাক্‌ল না।


ডায়াট্রিমা

ব্যাপার দেখে মনে হয়, মহাকাল বেছে বেছে এদেরই ধ্বংস করেছে। তার হাতে নানা অস্ত্র। এদের সে যেমন ভাবে গড়েছিল, যেমন আবহাওয়ার এরা উপযুক্ত ছিল, সহসা সে আবহাওয়া বদলে দিলে। বোধ হয় পৃথিবীর মেরুদণ্ড কোন এক অজ্ঞাত কারণে সহসা অন্যধারে হেলে পড়্‌ল। তারই ফলে আবহাওয়ার আগাগোড়া পরিবর্ত্তন হল। শীতের বুড়োটা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এরই প্রতীক্ষায় আকাশের এক কোণে বসে পৃথিবীর দিকে সাপের মত জ্যোতিহীন চোখে তাকিয়ে ছিল। সেই

সুযোগে লাঠি ভর দিয়ে সাদা দাড়ি উড়িয়ে সে ধরাতলে নেমে এল।

অমনি চারধারে নতুন দৃশ্য ফুটে উঠলো। বর্ণ শীর্ণ হয়ে গেল, পর্ব্বতমালার শিখরে শিখরে শুভ্র তুষার দেখা দিল, জল জায়গায় জায়গায় জমে গেল, এর উপর দিয়ে শুষ্ক হিম-বাতাস হু-হু করে ছুটে যেতে লাগ্‌ল। এতকাল গরম আবহাওয়ায় যারা সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিল, তাদের পক্ষে সময়টা হল দারুণ। মৃত্যুর দূত কৃপাণ হাতে চারধারেই অহরহ ঘুরতে লাগ্‌ল। তার গ্রাস থেকে বাঁচল তারাই যাদের শরীরে ছিল পালক; কিন্তু পাখী ছাড়া আর কারো শরীর তো তখন পালকে ঢাকা ছিল না। কাজেই তারা প্রাণ বাঁচাবে কি করে? বোধ হয় এই কারণেই অতিকায় সরীসৃপেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এদের পর যারা এসেছে, তাদের আকৃতি-প্রকৃতি ওদের চেয়ে পৃথক্। এরা হয়তো সেই শেষ দৃশ্যেও ছিল; কিন্তু খুব গোপনে, পর্ব্বত-কন্দরে, গুহায় বা অতিকায় সরীসৃপের পক্ষে ঐ রকমের কোন দুর্গম অঞ্চলে। এদের আকার হয়তো ছিল ইঁদুর, বেজী বা কাঠবেড়ালীর মতো। এরা সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে চলা-ফেরা করত। চারধারে রাক্ষসের রাজত্ব, কোথা দিয়ে কে আসে ঠিক কি?

মহাকাল যখন এই রাক্ষসগুলোকে নিঃশেষে বধ করে পৃথিবীর বন, প্রান্তর, জলাশয় নিরাপদ করলে, তখন তারা ধীরে ধীরে নেমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল। এরা হল স্তন্যপায়ী। তারপর থেকে এই বিরাট প্রাণিস্রোত পৃথিবীর ওপর দিয়ে নিশিদিন কালসাগরের দিকে বয়ে চলেছে।

তোদের সেই স্রোতধারার অন্ধকার গুহামুখে নিয়ে যাব।"

নবম অধ্যায়

স্তন্যপায়ীদের যুগ—নূতন আবহাওয়া

"আমাদের ধরিত্রী মাতা যেদিন সৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই সময় থেকে এই সেদিন পর্য্যন্ত তোরা কত দৃশ্য দেখলি! আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল রেখে কত নতুন নতুন সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল! কিন্তু এর মধ্যে কোনদিন কি একটি স্তন্যপায়ী প্রাণীকে দেখেছিস্? কোন একটি প্রাণীর মুখেও কি মানুষের কোন সাদৃশ্য ছিল?

চোখে না পড়লেও ওদেরই মধ্যে স্তন্যপায়ীদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল। আর তাই থেকেই প্রাণীদের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান্ প্রাণী মানুষও সৃষ্ট হয়েছে। মানুষ যে প্রথমে জলচর পোকা, তারপর খোলসধারী প্রাণী, তারপর মাছ, তারপর উভচর, তারপর সরীসৃপ, এমনি করে জীবনের সুদীর্ঘ পথে পথে চলে ক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করেছে, এতে অবিশ্বাসের কিছু নেই। আর এতে লজ্জা পাবার বা তার মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হবারই বা কি আছে? এর মধ্যে আছে কি বিচিত্র কৌশল!

এ ব্যাপার বিশ-পঁচিশ হাজার বৎসর ধরে ঘটেনি, ঘটেছে কোটি কোটি বৎসর ধরে। যে-সব মানুষ আজও বন্য অবস্থায় আছে, তাদের মধ্যেও খুব ধীরে পরিবর্ত্তন চল্‌ছে। আবার যারা সভ্য বলে গর্ব্ব করে, আকৃতিতে সুন্দর, লক্ষ বৎসর পরে তাদের অবস্থাও হয়-তো এমন থাকবে না। হয়তো ভাবীকালের মানবজাতি আমাদের বলবে অসভ্য বর্ব্বর বা কোন পশু-বিশেষ। তারাও হয়তো লজ্জায় আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকারে কুণ্ঠিত হবে।

মধ্যপ্রাণীর যুগে বা তারও আগে পৃথিবীতে যে ঘন বন লীলায়িত হয়ে উঠেছিল, আমাদের এখনকার বনের মতো তার এমন শ্যামলশ্রী, পাতা, ফুল, ফল কিছুই ছিল না। আর সে-সব ছিল জলার ধারে ধারে—সে যুগে কোথায়ও একটি ঘাস ছিল না।

কিন্তু এই নতুন প্রাণীর যুগে বন নানা জায়গায় বিস্তৃত হল—পাহাড়-পর্ব্বতের গায়ে পর্য্যন্ত তা উঠে গেল। সে বনে বসন্ত আসে, শরৎও আসে,—গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে, নতুন পাতায় গাছগুলি ভরে যায়। তখন চারধারে প্রজাপতি ও মৌমাছির মেলা লাগে।

বাহিরে এতকাল যে মাঠ রুক্ষ পড়ে ছিল, এখন তা সবুজ ঘাসে ঢেকে গেল। এখানে, ওখানে, সেখানে চারধারে ঘাস। পৃথিবীর সে রুক্ষ মূর্ত্তি আর নেই। চারধারে মহাসমুদ্র উচ্ছলিত হয়ে উঠ্ছে। কিন্তু তখনও পৃথিবীতে হিমালয়, আল্পস্ ও আন্দিজ পর্ব্বতমালা দেখা দেয় নি। এই যুগেই বিরাট ভূমিকম্পের ফলে ঐ পর্ব্বতগুলো পৃথিবীর বুকে দিকে দিকে উঠে দাঁড়াল। তবে ওদের মূর্ত্তি এখন যে রকম দেখা যায় তখন সে রকমের ছিল না। তুষার, বৃষ্টিধারা ও বাতাস, এই তিনটি মিলে ও আরও কয়েকটা কারণে ওগুলো বর্ত্তমান রূপ ধারণ করেছে।

মরুভূমি সৃষ্টির মূলেও ছিল প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ। এককালে যেখানে ছিল সমুদ্র বা গহন অরণ্য, সেখানে এখন প্রাণিহীন তপ্ত বালুময় মরুভূমি।

সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি—সেই ছোটবড় পর্ব্বতমালা, সেই ফেনায়িত নীল সমুদ্র, সেই নদী-জলধারা, সেই গহন বন, সেই উত্তপ্ত ভীষণ

মরুভূমি আজও প্রায় তেমনি আছে। কেবল পরিবর্তন হয়েছে প্রাণিজগতে।

এটাকে স্তন্যপায়ীদের যুগ বলাই ঠিক। সরীসৃপেরা ডিম প্রসব করত; কিন্তু স্তন্যপায়ীরা প্রসব করতে লাগল সন্তান। তারা সন্তান প্রসবের পর কিছুকাল তাকে স্তন্যধারায় পালন করে। সন্তানও মায়ের কাছে থাকে, মায়ের কাছ থেকেই জীবনধারণ করবার উপায়গুলো শিখে নেয়। তারপর বড় হলে, মায়ের সঙ্গে আর সম্বন্ধ রাখে না। এ ছাড়া স্তন্যপায়ীদের আর একটা বিশেষত্ব হল গায়ে লোম।

সরীসৃপ আর স্তন্যপায়ীর মাঝামাঝি একটি অবস্থা যে ছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে এ যুগের হংসচঞ্চু প্ল্যাটিপাস্। এদের বাস অষ্ট্রেলিয়ায়। এরা ডিম পাড়ে; অথচ এদের ছানারা স্তন্যপান করে।

বোধ হয় মনে পড়ছে মধ্যপ্রাণিযুগের বনে ষ্টিগোসরাস্ নামে একটা প্রাণী দেখা গিয়েছিল—জাত থেরিওমরফা রেপটাইলী। চেহারাটা তার কিম্ভূতকিমাকার! পিঠে কাঁটার মুকুট, মুখে কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে আছে, গা খস্‌খসে, পায়ে বড় বড় নখ, লেজটা মোটা! এবার মনে পড়েছে? সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর সরীসৃপেরাই স্তন্যপায়ীদের অতি-বৃদ্ধ পিতামহ।

এই যুগটাতে পাঁচটা দৃশ্য আছে।

সামনে যে বড় নদীটা দেখা যাচ্ছে, চল্ ওটা ধরে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি। নদীটার দুই তীরে বন-জঙ্গল, তালজাতীয় গাছ, মাঝে মাঝে ঘন ঘাসে ঢাকা সীমাহীন মাঠ।

ঐ দেখ, নদীর কূলে কত রকমের পাখী! পাখীগুলো পোকা-

মাকড় ও ছোট ছোট মাছ ধরে খাচ্ছে। ওদের পালকের রঙ বড় সুন্দর। ঐ যে বনেও পাখী ডাক্‌ছে। কিন্তু এ দৃশ্যের মাঝে কোথায়ও মানুষ দেখা যাচ্ছে না; এই বালি, আর কাদার ওপর তার পায়ের একটি ছোট দাগও নেই।

"যেখানে মানুষ নেই, সে জায়গাটা সত্যই বড় নির্জ্জন।" বল্‌তে বল্‌তে ঠাকুরদা সকলকে নিয়ে একখানা প্রকাণ্ড মাঠের ধারে এসে পড়লেন। সেই মাঠের ওপর খেঁকশেয়ালের মতো ছোট একদল প্রাণী ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল।

নাতি-নাত্নীরা চীৎকার করে উঠল—"ঠাকুরদা, ও কি? খেঁক-শেয়াল ঘাস খাচ্ছে?"

ঠাকুরদা হেসে বল্‌লেন—"একটু ভাল করে দেখ্। ওগুলো খেঁকশেয়াল নয়। ওরা ঘোড়ার পূর্ব্বপুরুষ, নাম ফেনাকোডাস্। ওদের মুখে, ঘাড়ের কেশরে, লেজে ঘোড়ার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এখন ওদের পায়ে খুর নেই; তার জায়গায় আছে পাঁচটা করে আঙুল। এমন নগণ্য আর এমন অদ্ভুত প্রাণী থেকে লক্ষ লক্ষ বছরে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কেমন করে ঘোড়ার মতো অত বড়, অমন সুন্দর একটা প্রাণী সৃষ্ট হল, এটা ভেবে দেখবার বিষয়।

তোরা তপিরের নাম শুনেছিস্? ব্রেজিলের বনে ওদের বাস। আরও কিছুদূর চল, ঠিক তপির না হলেও ওরই মতো একরকম অদ্ভুত প্রাণী দেখতে পাবি। এরাও নগণ্য। হয়তো মধ্যপ্রাণিযুগের শেষ দিকেও এরা ছিল; তবে আকারে ছিল আরও ছোট। এদেরই বংশধর হল অতিকায় হাতী।

বল্‌তে বল্‌তে ঠাকুরদা সকলকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। জলে

নানা রকমের মাছ খেলা করছে। এক একটা মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠ্ছে। হঠাৎ সামনের বনের মধ্যে হুড়মুড় শব্দ হল। কি যেন বনবাদাড় ভেঙে ছুটে আস্ছে! সকলে চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে দেখ্লে, তাদের সামনে এক অতিকায় গণ্ডার। তার নাকের



ত্রিখুরযুক্ত আদিম ঘোটক

ওপর ইংরেজী 'ভি' (V)র আকারে খড়গ। গণ্ডারটা ছোট ছোট চোখ দিয়ে তাদের সকলকে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখ্ছে, আর করছে ফোঁস্ ফোঁস্।

ঠাকুরদা আস্তে আস্তে বললেন—"এর নাম টাইটেনোথেরিয়াম। ভয় নেই, এগিয়ে চল্।"

তারা আবার চল্তে লাগল। নদী ক্রমে চওড়া হচ্ছে। সেখান থেকে বহুদূর এসে তারা দেখ্লে, গোটা-কয়েক সরীসৃপ বনের মধ্যে ঢুকে



নীহারিকা থেকে গ্রহ সৃষ্টির কাল্পনিক দৃশ্য

পড়ল; কয়েকটা গাছের উপর উঠে গেল। সবগুলোই আকারে ছোট।

ঠাকুরদা বললেন—"এ দৃশ্যে সরীসৃপ দেখে তোরা আশ্চর্য্য হচ্ছিস্? এ যুগেও সরীসৃপ আছে; তবে অতিকায়েরা কেউ আর নেই।"

তাঁর কথা শেষ না হতেই সকলে চীৎকার করে উঠল—"ঠাকুরদা, ভূমিকম্প, ভূমিকম্প! কি ভয়ানক শব্দ হচ্ছে! ঐ দেখ, সামনে আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে!"



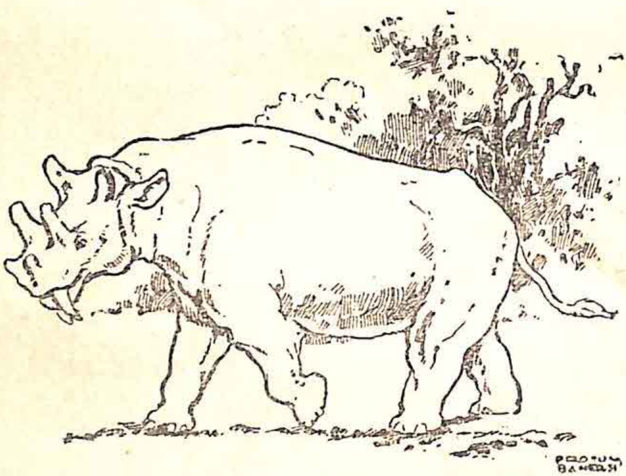
টাইটেনোথেরিয়াম

ঠাকুরদা শান্ত কণ্ঠে বল্‌লেন—"ভয় নেই; কেউ তোদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না—এগিয়ে চল্।"

কিন্তু এগিয়ে যাবে কোথা? সকলের পা আর চলে না। সামনে

ও কি ? চারটে শিঙওয়ালা গণ্ডার ? কি ভয়ানক ! ওর ওপরের দুটো দাঁত মুখের দুপাশে বেরিয়ে আছে ! জন্তুটা এ-বন থেকে ও-বনে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল ; কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—তার ভাবটা এই যে, কে আমার কি করবে ?

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ওর নাম ডাইনোসরাস। বেশ স্যাৎসেঁতে, যেখানে বনও বেশ ঘন, তার নীচে সূর্য্যের আলো পড়ে না, এমন জায়গাই ওরা বড় পছন্দ করে।



গণ্ডারের পূর্ব্বপুরুষ

ঐ যে আর একটা আস্‌ছে, ওঃ ! কি ভয়ানক দেখতে ? ওটার নাম—আরসিনোথেরিয়াম।"

তারা বন পার হয়ে মাঠের ওপর গিয়ে পড়ল। মাঠের ওপর চারধারে কড়কড় শব্দে ঘেসো ফড়িং লাফাচ্ছে। এক জায়গায় একটা সরীসৃপের মৃতদেহের কিছু অংশের ওপর গুবরে পোকা মাটি তুল্‌ছিল ;

তার ওধারে এক ঝাঁক গঙ্গাফড়িং উড়ছে। কলরব করতে করতে আকাশ দিয়ে এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল।

রৌদ্র বেশ প্রখর লাগছে। ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ভাই, আমার পাকা মাথাটা রোদে পুড়ে কালো হয়ে উঠছে। চল্, চল্, বনের ছায়ায় যাই।"



আরসিনোথেরিয়াম

ততক্ষণে তারা মাঠ পার হয়েছে। বনে ঢুকবে এমন সময় দেখলে, সামনে একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালে কয়েকটা ছোট ছোট বানর। বানরগুলো তাদের দেখেই সরে গেল। তবুও সেই সময়টুকুতেই মনে হল, প্রাণীগুলো অবিকল বানরের মত দেখতে না হলেও বানরজাতীয়—কতকটা লেমুরের মত। ঠাকুরদা বল্‌লেন—

"এদের আজ থেকে মনে করে রাখিস্। এই লেমুরদের পূর্ব্বপুরুষ এক রকম ছোট ছোট পোকাখেকো প্রাণী। তারা গাছে গাছে ঘুর ঘুর করে বেড়াত; গহন বনে খুব গোপনে বাস করত। চারধারে বড় বড় রাক্ষস, আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্ত্তন। এর ভেতর দুর্ব্বলের পক্ষে নিরাপদে জীবন-যাপন কি সহজ কথা?



লেমুর

লেমুরেরা গাছে গাছেই থাকে, কখনও মাটিতে নামে না। আবার এদের বংশ হল পরের ছোট-বড় বানরজাতি। তাদের মধ্যে যারা লাঙ্গুলহীন, তারাই মানুষের আদি। এরা সকলেই তো বন-চারী। তাই বনের সৌন্দর্য্য মানুষের এত ভাল লাগে; মানুষ সহজে তার বন্য স্বভাবও ছাড়তে পারে না। সময় সময় তার আচরণে তা প্রকাশ পায়।"

ইতিমধ্যে সকলে অনেকদূর এসে পড়েছে। বড় নদীটা থেকে কয়েকটা ছোট নদী এদিক-ওদিক বেরিয়ে গেছে; কয়েকটা নদী এদিক-ওদিক থেকে এসে তাতে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় খুব ঘন বন; বাতাস ভিজে ভিজে!

চলার পথে আরও কত রকমের প্রাণী তাদের চোখে পড়ল। ঠিক যখন তারা নদীর মোহনার কাছে তখন একটা অতিকায়

গণ্ডার তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার নাকের ওপর প্রকাণ্ড দুখানা খড়্গ পাশা-পাশি সাজানো। জন্তুটার নাম আরসিনো-থেরিয়াম।

আজকাল গণ্ডার ভীষণ-দর্শন হলেও এমন ভীষণ নয়। তাছাড়া এরা তাদের চেয়ে অনেক নিরীহ।

তাদের দেখামাত্র গণ্ডারটা রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে তেড়ে এল। তার বিশাল শরীরের ধাক্কায়, মোটা পায়ের চাপে ডালপালা এদিকে ওদিকে ভেঙ্গে, নুয়ে পড়তে লাগ্‌ল ; কিন্তু কিছুতেই সে ছেলেদের কাছে আস্‌তে পারল না। এর কারণ কি ?

সকলে অবাক্ হয়ে দেখ্‌লে, গণ্ডারটা তার এক প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে মাথা নিচু করে ধাওয়া করেছে।

ঐ যে—ঐ যে—সেটাও খড়্গ উঁচিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে ফিরে দাঁড়িয়েছে!

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"চল্—চল্—দাঁড়াস্ নি। ঐ শোন্ সমুদ্র গর্জ্জন করছে।"

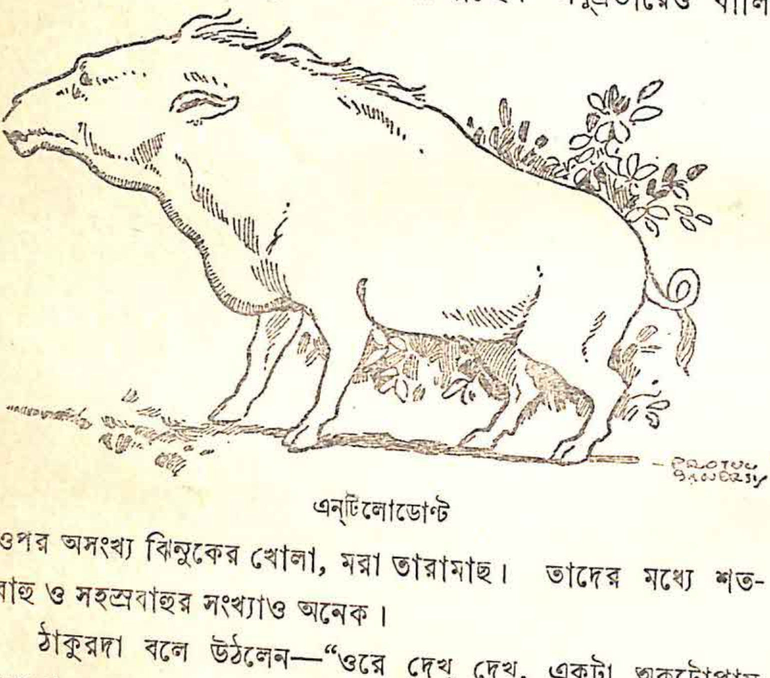
ছেলেরা বল্‌লে—"একটু দাঁড়াও। ওদের লড়াই দেখ্‌ব। ঐ দেখ—দেখ—দুটোতে লড়াই বেধেছে! ওঃ! কি ভয়ঙ্কর বেগে ওরা পরস্পরকে আক্রমণ করছে! ধম্ ধম্ আওয়াজ হচ্ছে। যাঃ! একটার দুখানা খড়্গের মাথাই ভেঙে গেল! ঐ সেটা পালাচ্ছে!"

সকলে আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।

বিজয়ীটা তার পিছনে ধাওয়া করতে করতে দুজনেই বনের আড়ালে অদৃশ্য হল।

সকলে আবার চলেছে—

নদীর মোহনা সেখান থেকে বেশী দূর নয়; কিছুক্ষণ চলেই তারা নদীর মোহনায় এসে দাঁড়াল। ঐ যে রৌদ্রোজ্জ্বল তরঙ্গ-চঞ্চল নীল সমুদ্র। আগের যুগে যা তারা দেখেছে, এ যুগেও সমুদ্রের সেই রূপ। তবে এযুগে সে-সব জলচর প্রাণী আর নেই; তার জায়গায় কতকগুলো নতুন প্রাণী দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রতীরেও বালির



এন্‌টিলোডোণ্ট

ওপর অসংখ্য ঝিনুকের খোলা, মরা তারামাছ। তাদের মধ্যে শত-বাহু ও সহস্রবাহুর সংখ্যাও অনেক।

ঠাকুরদা বলে উঠলেন—"ওরে দেখ্ দেখ্, একটা অক্টোপাস মরে পড়ে আছে। এদের পূর্ব্বপুরুষ হল নটিলাস। কাট্‌ল্ মাছও নটিলাস থেকে হয়েছে। নটিলাস শামুকজাতীয় প্রাণী। এ তোরা জানিস্। কিন্তু ঐ দেখ্ সামনে—"

সকলে তাকিয়ে দেখলে সমুদ্রের জলে প্রকাণ্ড একটা প্রাণী

ভাসছে। কতকটা মাছের মতো দেখ্‌তে; কিন্তু মুখে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি।

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ওঁর নাম জিউগ্লোডন। উনি তিমি, সীল আর শুশুকের আদি পুরুষের এক জ্ঞাতি—স্তন্যপায়ী! কোন এক সময়ে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে অথবা খাবারের সন্ধানে ওঁদের পূর্ব্বপুরুষ জলে নেমেছিলেন! তারপর থেকে জলে থাকবার অভ্যাস হয়ে যায়। একবার অভ্যাস হলে, তা আর সহজে যেতে চায় না। সেজন্যে উনিও জলেই আছেন! আবার ঐ শোন্ মাটির নিচে থেকে ঘর্ঘর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে! এই যে ভূমিকম্প হচ্ছে—"

ছেলেরা সভয়ে বলে উঠল—"ঠাকুরদা, সমুদ্রের মধ্য থেকে ঐ দেখ এক একবার ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে!"

ঠাকুরদা বললেন—"বোধহয় পাহাড় সৃষ্ট হচ্ছে।"

ঠাকুরদার কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ সমুদ্রের গর্জ্জনের চেয়ে ভয়ঙ্কর একটা গর্জ্জন শোনা যেতে লাগল। এক একবার মনে হচ্ছে, শব্দটা সমুদ্রের তলা থেকে উঠ্‌ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও ভয়ঙ্কর শব্দের সঙ্গে সমুদ্রের তলা থেকে মাটি, মাছ, কচ্ছপ, শামুক, কড়ি প্রভৃতি নানা রকমের জিনিষ আকাশের বহু ঊর্দ্ধে উঠে গেল। তার কতক পড়ল জলে, কতক ডাঙার চারধারে এবং যেখানে কেবল জল ছিল, সেখানে সৃষ্ট হল একটা পাহাড়!

তারপরও গর্জ্জন থামল না। মাটিও ঘন ঘন কাঁপছে, সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ছে, তীরের দিকে এক এক বিশাল ঢেউ ছুটে আসছে, আবার সরে যাচ্ছে, আবার আস্‌ছে।

দশম অধ্যায়

নূতন নূতন প্রাণী

"এ দৃশ্যে নতুন অভিনেতা বড় একটা কেউ নেই। তবে দু একজন এমন আছে যে, যাদের চেহারা দেখেই তোরা অবাক হয়ে যাবি! এদের মধ্যে একজনের নাম বেলুচিথেরিয়াম, আর একজন মোয়েরিথেরিয়াম।

একটা কথা তোদের বলে রাখি। তোরা হয়তো ভাবছিস্, সব যুগে সব সময়েই এক জায়গায় সব রকমের প্রাণী বুঝি বাস করত; তা কিন্তু নয়।

একই বন সব রকমের প্রাণীর, একই জলভাগ সব রকমের জলচরের বাসের উপযুক্ত হতেই পারে না। এখন যেমন প্রাণীরা জীবন ধারণের জন্য সুবিধামত পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, তখনও তাই ছিল। আবার জায়গা-বিশেষের জলবায়ুর গুণে সকলের শরীরের আকারও এক রকমের ছিল না। তার প্রমাণ দেখ্—গরু। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও আমাদের দেশের গরুর চেহারার মধ্যে কি রকম তফাৎ দেখেছিস্ তো?

চল, আজ সে-যুগের একটা হ্রদের ধারে যাই। বেশী দূর নয়, হ্রদটা ঐ যে—ওপার আকাশের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে আছে। এধারে নীল পাহাড়ের সারি। চারধারে কত রকমের পাখী উড়ছে, কূলে বালির ওপর দিয়ে কত রকমের পাখী চরে বেড়াচ্ছে! জায়গাটা বড় সুন্দর। এ-যুগের পাখীর গলায় চমৎকার সুর।



দারুণ ভূমিকম্পের পর পৃথিবীর সৃষ্টি হল।

একটা জিনিস তোরা লক্ষ্য করছিস্? চারধারে কত রকমের পোকা-মাকড়, জলেও পোকার মেলা? ঐ যে একটা জল-মাকড়সা জলের ওপর বসে নাচছে। ওরা ঐরকম করে শিকার ধরে।"

ঠাকুরদা সকলকে নিয়ে হ্রদের তীর ধরে এগিয়ে চললেন। এক জায়গায় একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল। এ পর্য্যন্ত তারা কোন সাপ দেখে নি। সাপটাকে দেখে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

ঠাকুরদা বললেন—"একটু সাবধানে চল্। এখন থেকে অনেক সাপ চোখে পড়বে। আবার হিংস্র জন্তুরও উৎপাত আছে। হায়েনাডন, একশ্রেণীর মাংসাশী ক্রিয়োডণ্ট, দাঁতাল শূয়র এখানে অনেক। ওদের অত্যাচারে নিরীহ উদ্ভিদ্‌ভোজীরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত।

ক্রিয়োডণ্টগুলোর কয়েকটি বোধ হয় ভল্লুক, সিংহ, বাঘ, নেকড়ে-জাতীয় প্রাণীদের আদিপুরুষ। দেখ্, দেখ্, হ্রদের দিকে তাকিয়ে দেখ্, কত বড় একটা কুমীর! রাক্ষসটা তোদের দিকে কি রকম হিংস্রচোখে তাকিয়ে আছে!"

ঠাকুরদার কথা শুনেই বোধ হয় কুমীরটা জলে ডুব দিল। তাদের সামনে কিছু দূরে একটা ফেনোকডাস হ্রদের কূলে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছিল। বড় নিরীহ প্রাণী। বেচারার তৃষ্ণা বোধ হয় তখনও মেটে নি, কুমীরটা হঠাৎ হুস্ করে তার সামনে ভেসে উঠেই কাঁটাভরা লেজের এক প্রচণ্ড ঝাপটায় তাকে জলে ফেলে দিয়ে ঘাড় কামড়ে ধরল। রক্তে জল লাল হয়ে গেল; ফেনোকডাসটা পা চারখানা একটু ছুঁড়লে। তারপর সব স্থির। কুমীর বা ফেনোকডাস

কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবল কয়েকটা ছোট ছোট ঢেউ এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে।

অশোক চীৎকার করে উঠল,—"ঠাকুরদা, ঐ দেখ, কুমীরটা একখানা চরের ওপর ফেনোকডাসটাকে নিয়ে উঠছে। ঐ আবার জলে ডুব দিলে।"

সকলে সেই দিকে তাকিয়ে আছে; কুমীরটাকে আর দেখা গেল না।

ঠাকুরদা বললেন—"এখান থেকে দুদিনের পথ, একটা জায়গা আছে। জায়গাটায় ঘন বন। সে বনে বেলুচিথেরিয়াম বাস করে। ওদের সমান ওজনের আর কোন প্রকাণ্ড প্রাণী এ-যুগের কোথায়ও খুঁজে পাবি না। কেবল শরীরটার ওজনই বিপুল নয়, ওদের গায়ের জোরের সঙ্গেও কারো তুলনা হয় না। মুখখানার চেহারাও বড় ভয়ঙ্কর। ওদের খাদ্য উদ্ভিদ্; কিন্তু ছোটখাট উদ্ভিদ্ নয়। বড় বড় গাছপালা না হলে ওদের পেটই ভরে না। বিশ হাত উঁচু গাছের আগা ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দে মুড়িয়ে খায়।

মোয়েরিথেরিয়াম্ও প্রকাণ্ড প্রাণী। এদের দাঁত দুটি খুব ছোট, শুঁড়ও একটুখানি—তবুও এদের সমীহ করা উচিত; কেননা এরা হল হাতীর এক পূর্ব্বপুরুষ। দেখতেও প্রায় হাতীর মতো। এরাও উদ্ভিদভোজী। চল্, প্রাণী দুটোকে দেখে আসি"—বলে ঠাকুরদা সকলকে নিয়ে এগোতে লাগ্লেন।

হ্রদের ধারে এক জায়গায় ঘন বন ছিল; তার মাঝে মাঝে পাথর পড়ে আছে। ঠাকুরদা সকলকে নিয়ে বনের ভেতর দিয়ে চলেছেন।

চল্তে কারো বিশেষ কষ্ট হল না; মাঝে মাঝে জলাশয় ও

ফলের গাছ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করবার পক্ষে ও দুটো যথেষ্ট। কিন্তু এর আগে সে বনের কোথায়ও কোন দিন মানুষের পা পড়ে নি; বড় ভয়াবহ বোধ হচ্ছে।

এক জায়গায় এসে তারা হঠাৎ একটা চীৎকার শুনতে পেলে। সামনে তাকিয়ে দেখে, একটা প্রকাণ্ড শূয়র,—গণ্ডার-বিশেষ—একটা হায়েনাডনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতেছে। তার ওধারে একটা হাত কুড়ি উঁচু গাছের মাথার ওপর একখানা কিম্ভূত-কিমাকার মুখ, পাতা ছিঁড়ে কচি কচি ডাল ভেঙ্গে খাচ্ছে। নিচে যে এমন ভয়ানক কাণ্ড বেধেছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই।

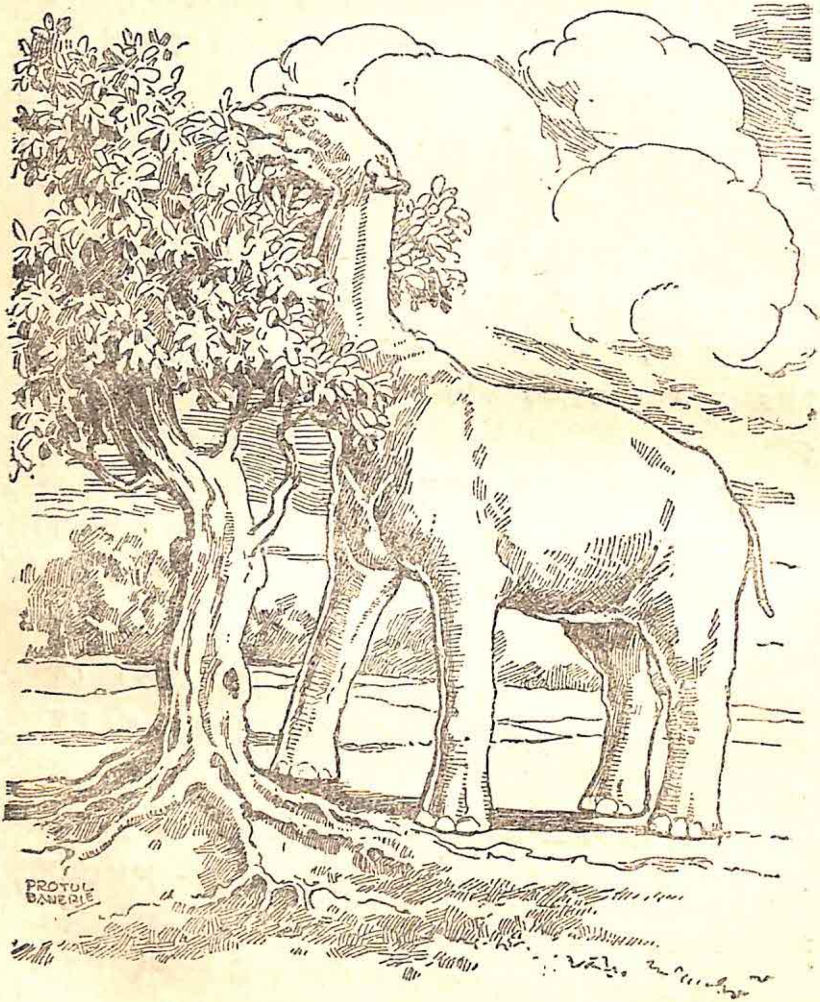
ঠাকুরদা বললেন—"ঐ যে বেলুচিথেরিয়াম।"

বেলুচিথেরিয়ামের শরীরটা গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। পাতা খেতে খেতে সে এধারে সরে এল। এবার তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শরীরটা লোমে ঢাকা। তাকে দেখেই এধারের যোদ্ধারা রণে ভঙ্গ দিয়ে যে যেদিকে পারলে দিলে দৌড়। সেও একটা বিকট ডাক ছাড়লে। এখন যেখানে বেলুচিস্থান, এই জন্তুর বাস সেখানে ছিল।

ঠাকুরদা বললেন—"ঐ বিপুলকায় প্রাণীদের মধ্যে যখন যুদ্ধ বাধে, মনে কর দেখি, তখন কি ভয়ানক কাণ্ড হয়? গাছ-পালা ভেঙ্গে, মাটি গর্ত্ত হয়ে, সব একাকার হয়ে যায়!

আরে, ঐ দেখ্ এক পাল মোয়েরিথেরিয়াম ঐ জলাশয়টার ধারে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যা হয়ে এল; এখন ওদের জল খাবার সময়।

এ-যুগের পৃথিবী পাখীর কলরবে, জন্তু-জানোয়ারের হাঁক-ডাকে



বেলুচিথেরিয়াম

ভরপূর। এখন শরৎ, বসন্ত, বর্ষা ও শীত ঋতু ঘুরে-ফিরে আসা-যাওয়া করছে।

এই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতেও ধীরে পরিবর্ত্তন চল্‌ছে। এখনও মাঝে মাঝে পাহাড়-পর্ব্বত দৃষ্ট হচ্ছে, নদী-হ্রদ-সমুদ্রের কলরব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মানুষ কোথায়ও নেই, তার পূর্ব্বপুরুষেরা গহন বনের শাখায় শাখায় সন্তান-সন্ততি নিয়ে জীবন ধারণ করছে। সুদূর-ভবিষ্যৎ কালে তখনকার পৃথিবীর নগণ্য ভীরু শাখাবাসী এই জীবই যে সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে উঠবে তা কে জানত?”



একাদশ অধ্যায়

হাতীর আবির্ভাব—বনমানুষের পূর্ব্বপুরুষ

ঠাকুরদার গল্পের স্রোত তখনও থামে নি। তিনি অনর্গল বলে চলেছেন—

"দিন, মাস, বছর, শতাব্দী, সহস্রাব্দীর স্রোত কালসাগরের দিকে ক্রমাগত বয়ে চলেছে। এর সঙ্গে পৃথিবীতেও পরিবর্ত্তন হচ্ছে। আগের যুগে যে-সব প্রাণী ছিল, তাদের এ-যুগে ভাল করে চেনা যায় না; দেশ, নদী, হ্রদ, এমন কি পাহাড়-পর্ব্বতেরও আকার কিছু কিছু বদলে গেছে। বন কোথায়ও হয়েছে পাতলা, কোথায়ও আরও ঘন।

আকাশ-পথে সজল মেঘের ভার নিয়ে বর্ষা আসে, আবার চলে যায়, তারপর আসে শরৎ—পৃথিবীর চারধারে সৌন্দর্য্য ফেটে পড়ে। কিন্তু প্রাণি-জগতে সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ উপাসক মানুষ তখনও পৃথিবীতে দেখা দেয় নি; তখন সে শাখায় শাখায় পশুর জীবন যাপন করছে।

এ-যুগে পৃথিবীর বনে-প্রান্তরে, পর্ব্বতের উপত্যকায়, জলে নানারকমের বিশালকায় স্তন্যপায়ীর মেলা।

বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর মাত্র তিনটি দেশে হাতীর বাস—ভারতবর্ষ, সিংহল আর আফ্রিকা। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে পৃথিবীর উত্তরদিকে নানা দেশের বনে হাতী ছিল। তবে তাদের আকার ছিল অন্য রকমের।

চল্ বনের পথে বেরিয়ে পড়ি। এখনই হয়তো এক পাল ম্যাষ্টোডনের সঙ্গে দেখা হবে।"

সকলে বনের ধারে চলে এল।

ঠাকুরদা বললেন—"এদের চেহারা দেখে কিন্তু ভয় পাস নি। মধ্যপ্রাণিযুগের সরীসৃপদের তুলনায় এরাও কম কিম্ভূতকিমাকার নয়।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ্; ঐ যে গাছের আড়ালে এক জোড়া দুষ্ট চোখ। ওটা ম্যাষ্টোডন। শয়তানটা এখনই আমাদের দিকে তেড়ে আস্‌বে। এ-যুগে ওরাই বড় প্রাণী। ওদের শুঁড় ছোট, মুখে ওপর ও নিচে চারটে দাঁত—দাঁতগুলোর আগা সরু। প্রাণী-গুলোর গায়ে বড় বড় লোম। কি বিকট এক আওয়াজ করলে, শুনলি? এখান থেকে এগিয়ে চল্। ওদের এক অদ্ভুত চেহারার জাত ভাইকে দেখে আসা যাক্। তারা দলে দলে বেড়ায়।"

ঠাকুরদা সকলকে নিয়ে দূরের একটা ঘন-বনে প্রবেশ করলেন। তাঁদের সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ভল্লুক ছুটে গেল। ভল্লুকটা বোধহয় খাবার লোভে চলেছে। এ যুগে ভল্লুকের অভাব ছিল না। এরা সাধারণতঃ পর্ব্বতগুহায় বাস করত; এদের স্বভাব ছিল অত্যন্ত হিংস্র।

আরও কিছুদূর গিয়ে তারা একখানা প্রকাণ্ড মাঠের ধারে এসে পড়ল। তখন তার ওপর দিয়ে একপাল কৃষ্ণসার হরিণ ছুটতে ছুটতে চলেছিল। তাদের পিছনে ছুটছিল কয়েকটা হায়েনাডন্।

ঠাকুরদা বললেন—"বেচারা হরিণগুলোর আজ বড় বিপদ। হায়েনাডন্‌গুলোর মুখে ওদের চার-পাঁচটার প্রাণ যাবেই।

এর সঙ্গে যদি খড়গদন্তী বাঘ যোগ দিত, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। এই বাঘগুলোকেও তোরা শীঘ্র দেখ্‌তে পাবি। তাদের ওপরের দুটো দাঁত অবিকল তলোয়ারের মত বাঁকা।"

ঠাকুরদার কথাই ঠিক। একটা হরিণকে দুটো হায়েনাডন্ দাঁতে ও নখে ছিঁড়ে-খুঁড়ে সেই মাঠের মধ্যেই ভোজ লাগিয়ে দিলে।

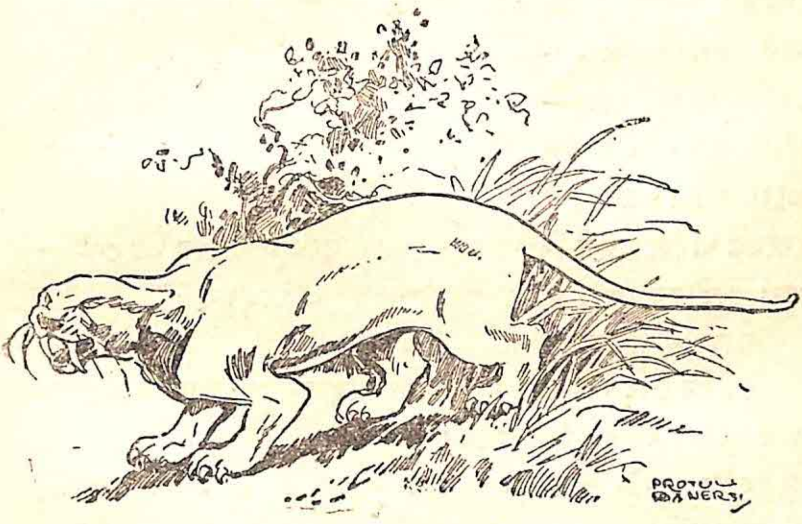


হায়েনাডন্

ঠাকুরদা বললেন—"ওরা ছাড়া আরও কয়েক রকমের হরিণ আছে। তাদের মাথায় দুটো ছোট ছোট শিঙ্ তো আছেই, আবার নাকের ওপরও ছোট এক জোড়া শিঙ্। আবার, আর এক রকমের হরিণ দেখ্‌তে পাবি, যাদের মাথায় শিঙ্ জোড়া দেখে মনে হয় সবে উঠেছে, কিন্তু নাকের শিঙ্ একটু বড়। তবে এ বনে তারা থাকে না।" বল্‌তে বল্‌তে তিনি সকলকে নিয়ে বনে ঢুক্‌লেন।

কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড শ্লথ পোকা-মাকড় খেয়ে বেড়াচ্ছিল। আমাদের একালের শ্লথেরা গাছে থাকে, মাটিতে নামে না; কিন্তু সে-যুগে ওরা থাকত মাটিতে, গাছে উঠতে পারত না। সকলের সাড়া পেয়ে শ্লথটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

আরও কিছুদূর গিয়ে অশোক বললে—"ঠাকুরদা, দেখ দেখ, ঐ

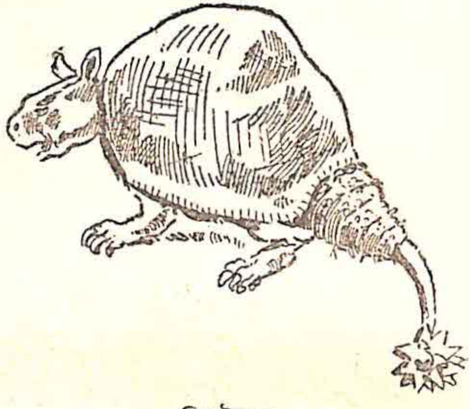


খড়্গদন্তী বাঘ

যে একটা অদ্ভুত জন্তু। গায়ে কাছিমের মত খোলা, মুখখানা কতকটা শেয়ালের মত, লেজটা যেন হাতুড়ি; লেজের আগাটা বলের মত গোল, তার চারধারে লম্বা কাঁটা।"

ঠাকুরদা বললেন—"ওটার নাম গ্লিপ্টোডন। ওরা পোকা-

মাকড় খায়। এর পরের দৃশ্যে এদের চেহারা আবার অন্য রকম দেখ্‌বি, তারপর আর একরকমের। আজকাল-কার পিপীলিকাভুক্, আরমাডিলো প্রভৃতি এদেরই বংশধর। ওর লেজটাকে হাতুড়ি না বলে কাঁটাওয়ালা নব-কেরি—গদার মতো—বলাই ঠিক। এটা হল ওদের অস্ত্র; শত্রুকে ঐ লেজের ঘা দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। তবে আমাদের ভয় নেই—ওরা অতীতকালের, আমরা বর্ত্তমানের। এগিয়ে চল্—"



গ্লিপ্টোডন

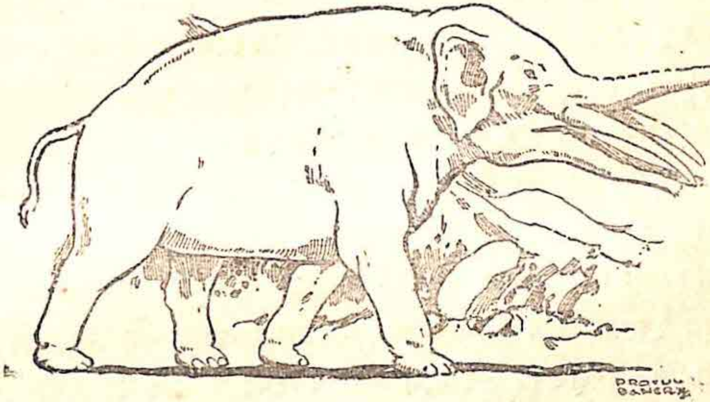
তারা আবার চলেছে।

সে বন শেষ হয়ে গেল। সামনে পাহাড়মালা; তার নিচে থেকে মাঝ বরাবর ঘন বন উঠে গেছে।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শব্দ তাদের কানে এল। সকলে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে, একপাল অতিকায় ম্যাষ্টোডন তাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সকলকে মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌ছে। ম্যাষ্টোডনগুলোর সারা গায়ে লোম।

মিনিট খানেক পরে আবার একটা শব্দ হল। ম্যাষ্টোডনগুলো একটু নড়ে-চড়ে হঠাৎ শুঁড় তুলে মাটি কাঁপিয়ে তাদের দিকে সোজা ছুটে আসতে লাগল।

ঠাকুরদা সকলকে নিয়ে ততক্ষণে বহুদূরে সরে গেছেন। কিন্তু যাবেন কতদূর? সামনেই এক জলা জায়গা; তার তীরে কয়েকটা অতিকায় শূয়র চরে বেড়াচ্ছে। শূয়রগুলোর চেহারা দেখে নাতি-নাতনীদের মুখ ভয়ে এতটুকু! অতবড় দাঁত, এত বড় শূয়র



ম্যাষ্টোডন

তারা কল্পনাও করতে পারে না। ভাগ্যে এ বন তখন মানবহীন ছিল!

ঠাকুরদা বললেন—"মানুষ যখন বনে বাস করত তখনও বড়-বড় জন্তু-জানোয়ারের অভাব ছিল না; তোরা নিজের চোখেই তা দেখতে পাবি। এ গাছটার ওপর দিকে তাকিয়ে দেখ্—"

সকলে দেখলে, দুটো বন-বেড়াল গাছের ডালে ওৎ পেতে বসে আছে, বোধহয় পাখী ধরবে। বোধহয় কি সত্যই! ঐ যে সামনে কিছুদূরে একটা বড় পাখী বসে বসে ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে।

একটা বেড়াল খুব সন্তর্পণে হাতখানেক এগিয়ে গেল। বেড়ালটার লেজের আগা একটু একটু নড়ছে, চোখ জোড়া জ্বল্‌ছে, সারা শরীরের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে। তারপর চক্ষের পলকে বেড়ালটা পাখীটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। অমনি ভীত আহত পাখীটার কাতর স্বরে সেই নির্জ্জন বন ভরে উঠল। তারপরই সব চুপ্! কেবল ডালে ডালে বাতাস সর্ সর্ করে বয়ে চলেছে। আর ঐ যে পাতার ওপর কয়েকটা ফোঁটা রক্ত টপ্ টপ্ করে পড়ল!

এমন হত্যাকাণ্ড বনে বনে দিনরাত চল্‌ছে।

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"আরও দু রকমের ভীষণাকার জন্তু আছে—তাদের একটার নাম পাইরোথেরাস্। আর একটার নাম টাইপো-থেরাস্। সময় থাকলে তাদের দেখাতে পারতুম। কিন্তু এখনও বহুদূর যেতে হবে। পৃথিবীর স্থলভাগ এখন কম নয়, বনও নানা দিকে বিস্তৃত। এর মধ্যে কত রকমের পাখী ও স্তন্যপায়ী যে বাস করে কি বল্‌ব? এগিয়ে চল্।"

সকলে ঠাকুরদার পিছনে পিছনে সেই নিস্তব্ধ বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চল্‌ল।

শুক্‌নো পাতায় বনের তলা ভরা; লতায়, ডালে চারধার দুর্গম। সূর্য্যের আলোর অভাবে বনতল অন্ধকার।

ঠাকুরদা এক জায়গায় এসে চুপ করে দাঁড়ালেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হল, তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে কি শুন্‌ছেন! সকলেই চুপ। হঠাৎ ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ঐ শোন্।"

"কি ঠাকুরদা?"

"দূরে কোথায় যেন শিম্পাঞ্জী ডাক্‌ছে!"

"শিম্পাঞ্জী ?"

"ঠিক শিম্পাঞ্জী নয়, তবে শিম্পাঞ্জীর মত লেজহীন, প্রকাণ্ড এক রকমের বনমানুষ জাতীয় জীব। দেখবি ওদের ? ওরা কিন্তু ভয়ানক হিংস্র—মানুষের জ্ঞাতি হলেও মানুষকে ওরা মোটেই পছন্দ করবে না—"

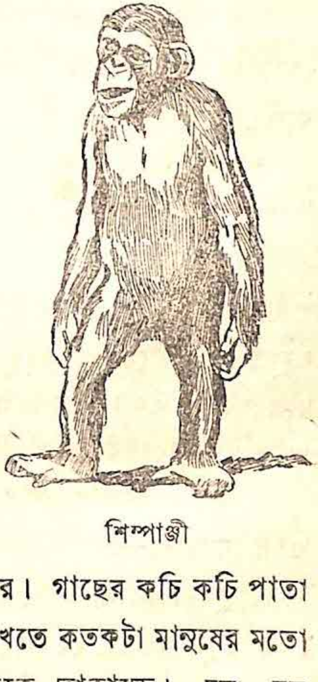
"তবে কাজ নেই—"

"তবুও যখন এসেছিস্ অন্ততঃ দূর থেকে দেখে যা।"

তারা এগিয়ে চল্‌ল। কিছুদূরে গিয়ে শুন্‌লে, গাছের ডাল-পালা নাড়ার শব্দ।

ঠাকুরদা মুখে আঙুল দিয়ে ইসারা করলেন—"চুপ !"

সকলে চুপ করে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।



শিম্পাঞ্জী

ঠাকুরদা ফিস্ ফিস্ করে বললেন —"ঐ যে গাছের ডালে শিম্পাঞ্জী পরিবার। গাছের কচি কচি পাতা ছিঁড়ে ও ডাল ভেঙ্গে খাচ্ছে। ওদের দেখতে কতকটা মানুষের মতো নয় ? কি রকম রুক্ষ চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। চল্, বন থেকে বেরিয়ে পড়ি। এবার সমুদ্রের দিকে যাই—"

তারা সেই শিম্পাঞ্জী-সদৃশ প্রাণীগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে ঠাকুরদার পিছন পিছন চল্‌ল।

পথে আরও কতকগুলো নতুন ধরণের প্রাণী তাদের চোখে

পড়ল। তার মধ্যে একটার নাম ডিনোথেরিয়াম। এরা হাতীর জাত; মুখে দুটো দাঁতও আছে, কিন্তু দাঁত জোড়া নিচের চোয়াল থেকে বেরিয়ে নিচের দিকে বেঁকে গেছে। এরা জলা জায়গায় থাকে; পাঁক খুঁড়ে গাছের শিকড় খায়।

একপাল ঘোড়া তাদের সামনে দিয়ে ছুটতে ছুটতে গেল। এ যুগে ঘোড়াগুলোর চেহারা অনেক বদলে গেছে। দেখলে, ঘোড়া বলে চেনা যায়।

বন ছাড়াতেই সামনে দেখা গেল পাহাড়। ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ওর ওধারে সমুদ্র। ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ—"

তারা পাহাড়ের ধার দিয়ে পথটা পার হয়েই সমুদ্রের গর্জ্জন শুনতে পেল। মাঝপথে উঠতেই দেখ্‌লে, সামনে সীমাহীন নীল সমুদ্রে ঢেউ উঠছে; কিছুদূরে ছোট একটু দ্বীপের মত দেখা যাচ্ছে। দ্বীপটা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে, আর তার একপ্রান্ত থেকে একটা ফোয়ারা উঠছে।

সকলে চীৎকার করে উঠল—"দ্বীপ—সচল দ্বীপ, আর তার ওপর ফোয়ারা—"

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"দ্বীপ নয় রে, ওটা তিমি। তিমি স্তন্যপায়ী! সেই সুদূর অতীতে যে জিউগ্লোডন দেখেছিলি, ওরা তারই বংশধর! কিন্তু আকারে কত তফাৎ দেখ্। খুঁজলে বোধ হয় সীলও চোখে পড়বে।"

দ্বাদশ অধ্যায়

হিমের যুগ—পৃথিবীব্যাপী বিরাট প্রবাস-যাত্রা

"নক্ষত্রলোকের এক বিন্দুপরিমাণ জায়গা জুড়ে যে নীহারিকাটি বিস্তৃত ছিল, পৃথিবী যখন তার উত্তপ্ত বাষ্পকণায় মিলিয়েছিল, তখন থেকে গত যুগ অবধি আমরা পার হয়ে এলাম।

এ একটা বিরাট কাল; এর সীমা আছে সত্য, কিন্তু আমাদের তা চোখে পড়ে না। এই সময়ের মধ্যে, আমাদের এই একটুখানি পৃথিবীতে কত কাণ্ড ঘটেছে! সেগুলো যেন ঐ বিরাট কালসাগরের ঢেউ। এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা, প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জগতের সৃষ্টি।

তারপর থেকে আবহাওয়ার সঙ্গে মিল রেখে প্রাণীরা সারা পৃথিবীতে কেমন ছড়িয়ে গেল! ছোট যারা ছিল, তারা হল বড় ও বিভিন্ন আকৃতির; বড় যারা ছিল, তারা হল ছোট;—তাদেরও আকৃতি গেল বদলে।

একটা মজার কাণ্ড তোরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য কর্ছিস্ যে, একটি মাত্র প্রাণী থেকে নানারকম প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে—যেমন, একটি প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয়েছে গুবরে পোকা, ফড়িং, আরশুলা, প্রজাপতি, মৌমাছি ইত্যাদি।

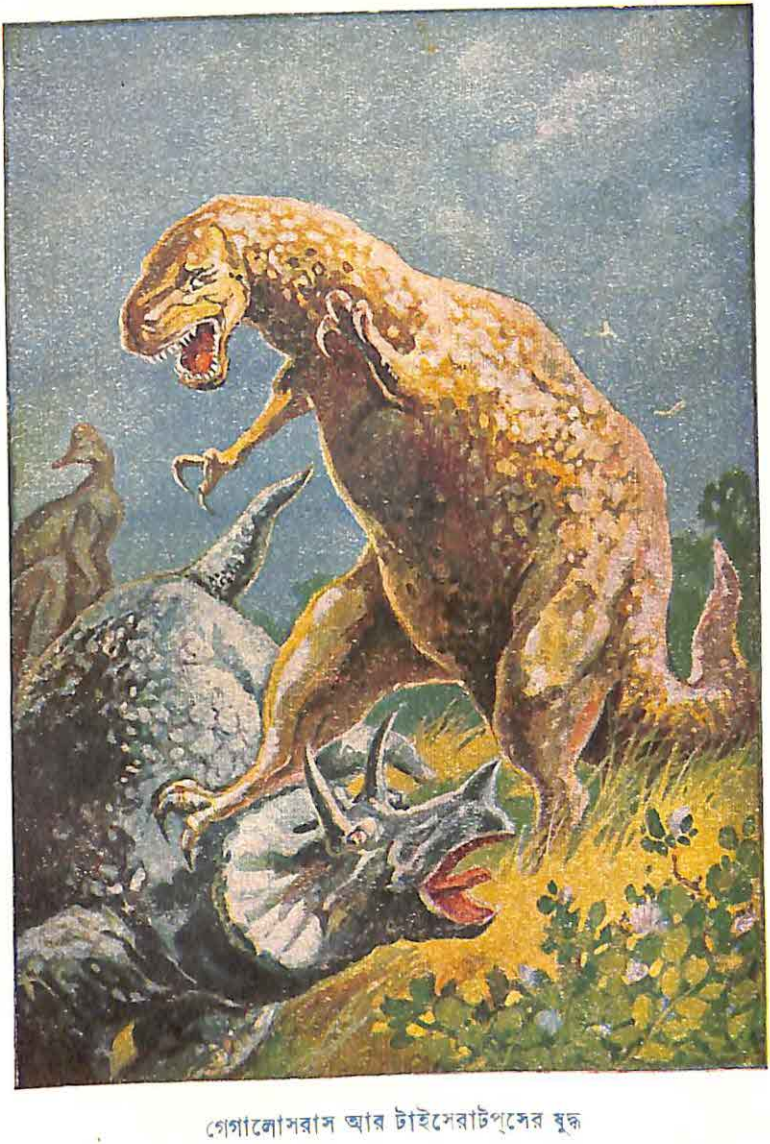
কি করে এবং কেন হল, তা ঠিকমতো হয়তো বলা যাবে না; তবে এটুকু ধরা যাবে, কে কার আদিপুরুষ।

এই দুস্তর কালসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে একটা ব্যাপার কি তোদের কারো চোখে পড়েছে ?

সে ব্যাপারটা হল, পৃথিবীর আবহাওয়ার উত্তাপের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন। বাতাস ক্রমেই শীতল হয়ে আস্‌তে লাগল। পৃথিবী সেই আদিকাল থেকে সূর্য্যের চারধারে ঘুরে চলেছেন। তাঁর পথটি প্রথমে ছিল গোল, কিন্তু নানা কারণে ক্রমে হয়ে আসতে লাগল ডিম্বাকৃতি। তারই ফলে শীত বাড়তে লাগল; শীতের বুড়োটা কিছুতেই পৃথিবী থেকে নড়তে চাইছিল না, আর গ্রীষ্মকালটা ক্রমে হয়ে আসছিল ছোট। শেষে এমন এক সময় এল, যখন সেই আদি-কালের প্রাণহীন, উদ্ভিদ্‌শূন্য, জলশূন্য উত্তপ্ত পৃথিবীর অর্দ্ধেক ঘন বরফে ঢেকে গেল !

সে এক দারুণ দুঃসময় !

এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার অর্দ্ধেক ছিল বরফে ঢাকা। কোথাও সুদীর্ঘ তুষার-স্রোত অতি ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছে বড় বড় পাথর। কোথাও বরফের সাদা পাহাড় উঠেছে, কোথাও বরফের সীমাহীন কঠিন প্রান্তর রৌদ্রে জ্বলে ওঠে, জ্যোৎস্নায় সুন্দর রূপ ধারণ করে। ঠাণ্ডায় সমুদ্রের জল জমে কমে গেল, কত নদীও জমে কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। কত পাহাড়-পর্ব্বতের ওপর থেকে বিশাল তুষারের চাপ ও সেইসঙ্গে পাথর ভেঙে পড়তে লাগল। সে সবুজ বন আর রইল না, তার জায়গায় রইল কেবল পাতাশূন্য তুষারে-ঢাকা বড় বড় গাছ; তাদের আকৃতি আবার নানা রকমের। এই ভয়ানক সময়ে অর্দ্ধেক পৃথিবী জুড়ে থেকে থেকে প্রকাণ্ড তুষার-ঝড় বয়ে যেতে শুরু করলে।



মেগালোসরাস আর টাইসেরাটপ্সের যুদ্ধ

তোরা ভাব্‌ছিস্‌, নিশ্চয়ই পৃথিবী এ সময়ে প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌শূন্য হয়ে পড়েছিল। তা নয়। এই দারুণ দুর্দ্দিনেরই বোধ হয় লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীর ভাবীকালের অধীশ্বর মানুষ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে কোথায়, কবে, কেমন করে, তা জানি না। তবে সে-যুগে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধরাতলে এসেছিল, আর বহু কষ্ট ও দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবনের পথে পথে চলেছিল, তার নানা চিহ্ন তারা অযত্নে, হেলায় পৃথিবীর বুকে ফেলে গেছে।

এই হিমের যুগে পৃথিবীতে যে-সব প্রাণী ছিল, তাদের অনেকেই আজও আছে—ডাঙায় সিংহ, বাঘ, ভল্লুক, নেকড়ে, সাপ, হায়েনা, হাতী, উট, গণ্ডার, ঘোড়া; জলে শুশুক, তিমি, সীল, ডুগং, মাছ ইত্যাদি। তবে মানুষের আকারের সঙ্গে এদেরও কারো কারো আকৃতি বদ্‌লেছে; কিন্তু স্বভাব বদ্‌লায় নি।

ঐসব প্রাণীদের মাঝে এক রকম নিরস্ত্র হয়েই অতীতের সেই মানবেরা পর্ব্বতগুহায় বা গহন বনে বাস করত। তাদের না ছিল পোষাক, না ছিল ঘরবাড়ি; খাদ্যের মধ্যে ছিল পশুর কাঁচা মাংস। তাও আবার বহু কষ্টে সংগ্রহ করতে হ'ত। চল্‌, মাঠে বসে এদের গল্প একে একে বলব—"

সকলে ঠাকুরদার সঙ্গে মাঠে এসে বস্‌ল।

ঠাকুরদা তাঁর গল্পের থলির মুখ খুলে দিয়েছেন; তিনি বল্‌ছেন—"সে-যুগে আবহাওয়া যেমন বদ্‌লে গেল, সেই প্রচণ্ড শীতে প্রাণী ও উদ্ভিদেরা যাতে প্রাণধারণ করতে পারে, সৃষ্টি যাতে একেবারে ধ্বংস না হয়ে যায়, প্রকৃতি তারও উপায় করে দিলে।

সাধারণত স্তন্যপায়ীদের গায়ে কিছু কিছু লোম থাকেই; এ-যুগে

৭

আবার প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ থেকে শরীরকে রক্ষা করবার জন্যে তাদের গা লম্বা ঘন লোমে ঢেকে গেল।

কিন্তু ঠিক যে কিভাবে সে-যুগের, কেবল সে-যুগের কেন, বিরাট অতীতকালের প্রাণীরা জীবনধারণ করত, আর তাদের গায়ের রঙ কেমন ছিল, তা বলা কঠিন ; তবে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

আমরা যে-কালে বাস করছি, এই কালে দেখা যায়, ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বন্য পশুপাখীও এক দেশ থেকে আর এক দেশে, এক বন থেকে আর এক বনে হাজারে হাজারে দল বেঁধে চলে যায়।

শীতের মুখেই তো আমরা দেখি, আমাদের বাংলা দেশের কোমল নীল আকাশপথে হিমালয়ের পার থেকে হাঁসের সারি উড়ে আসে—এর আর বিরাম নেই। নিশিদিন তারা আস্‌ছে। তাদের কলরবে, পাখার শব্দে পদ্মার নির্জ্জন বিশাল চর, সুন্দরবনের বিজন খাল ও জলার ধার মুখরিত হয়ে থাকে। তারপর আবার শীতের শেষে ওরা হিমালয়-পারে উড়ে চলে যায়।

কেবল বাংলা দেশেই নয়, পৃথিবীর নানা জায়গায় এই ব্যাপার ঘট্‌ছে।

হয়তো একদিন দেখা গেল, লক্ষ লক্ষ পাখী আকাশপথে দেশ-দেশান্তরে উড়ে চলেছে ; লক্ষ লক্ষ মাছের ঝাঁক সমুদ্রের এক অংশ বা উপকূল থেকে আর এক অংশে সাঁতরে যাচ্ছে ; হাজার হাজার হরিণের পাল এক বন থেকে বনান্তরে যাত্রা করেছে। পথের দূরত্ব, গভীর সমুদ্র, খরস্রোতা নদী, সুবিশাল হ্রদ, উন্নত পর্ব্বতমালা, জলশূন্য প্রান্তর, কিছুই তাদের গতিরোধ করতে পারে না। এদের কেউ যায় শরতে, কেউ যায় শীতে, কেউ যায় গ্রীষ্মে, কেউ আবার ভেসে

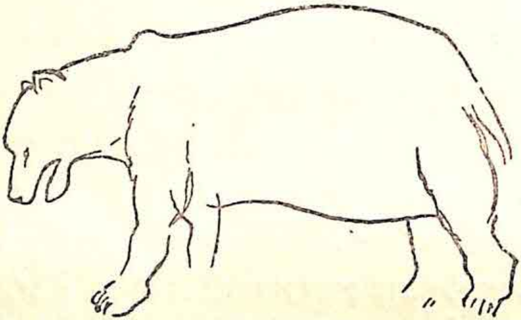
আসে বর্ষার নূতন জলধারায়। প্রতি বৎসর এই যাওয়া-আসা চল্‌ছে। অবশ্য এই সময়ে নানা কারণে এদের মধ্যে অনেকে প্রাণ হারায়। ফলে, সংখ্যাও কমে আসে।

হিম-যুগের সেই প্রচণ্ড শীতের আগমনেও নিশ্চয়ই প্রাণিজগতে একদিন এমনি মহাব্যস্ততা দেখা দিয়েছিল।

জল, স্থল, আকাশ, যেদিকে তাকাও প্রাণিস্রোত চলেছে। তাদের লক্ষ্য গরম দেশ; কিন্তু গরম দেশটা যে কোথায়, তা বোধ হয় তাদের জানা ছিল না। এটাকে 'অন্বেষণ' বলা যেতে পারে। যাত্রাপথে সকলেই যে নিরাপদে চলেছে, পথের শেষে সকলেই যে আশ্রয় পাবে, তা কিন্তু নয়। কত পশু পাখী মাঝপথেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দুর্ঘটনায় মারা পড়বে। এইখানে একটা কথা ব'লে রাখি। পণ্ডিতদের মতে, সেকালে ভারতবর্ষের বা এশিয়ার সঙ্গে আফ্রিকা ও উত্তর-আমেরিকার স্থলপথে যোগ ছিল; কাজেই এই প্রবাস-যাত্রা খুব দীর্ঘকাল ধরে হয়েছিল ব'লেই মনে হয়।

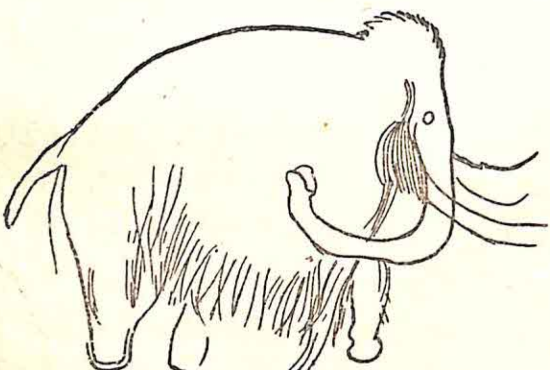
এই যাত্রিদলের পিছনে বোধ হয় সেকালের মানুষও ছিল। তাদের হাতে অস্ত্রের মধ্যে ছিল খানকয়েক পাথর, কিন্তু মনে ছিল অসীম সাহস, শরীরে অমিত শক্তি। তারাও হিমের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে গরম দেশের উদ্দেশে অতি দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে চলেছিল। মানুষ হলেও পৃথিবীর বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। কোথায় কি আছে, তা তাদের জানা ছিল না। পৃথিবীর সব জিনিষও তারা চিনত না। তাদের অভাব ছিল অল্প; ভাষা ছিল স্বল্প। জীবনধারণের জন্য মাত্র যে-কয়েকটি উপকরণের আবশ্যক—খাদ্য, অস্ত্র ও আশ্রয়, এই কয়টি সংগ্রহ হলেই তারা সন্তুষ্ট হ'ত।

মনে কর, আমরা এখনও সেই হিম-যুগে বসে আছি। সে-যুগের ম্যাস্টোডন, এ-যুগে হল্ ম্যামথ। ম্যামথগুলোর চেহারা



প্রাচীন মানবের গুহাগাত্রে আঁকা সেকালের ভল্লুকের ছবি

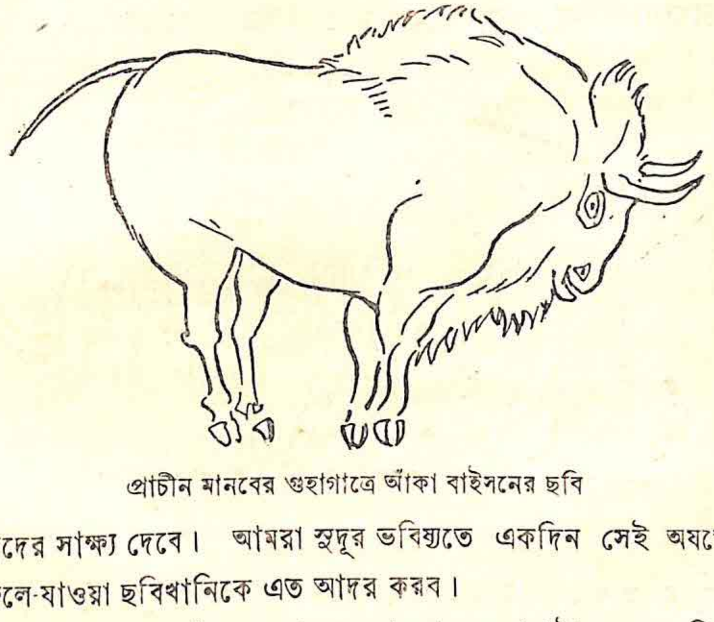
কল্পনা করে নিতে হবে না। এরা হাজার পঞ্চাশ বছর আগেও



প্রাচীন মানবের গুহাগাত্রে আঁকা ম্যামথের ছবি

পৃথিবীতে বিচরণ করত; সভ্য মানবজাতির কেউ তাদের না দেখ্‌লেও আদিম মানবজাতি তাদের পাশাপাশি বাস করত। তাদের

মধ্যে যারা ছবি আঁকতে পারত, তারা কেউ কেউ সেই সুদূর অতীত কালে নির্জ্জন গুহামধ্যে একাকী বাস করে একমনে গুহার দেওয়ালে দু'একটি ম্যামথের বা ভালুকের ছবি এঁকে রেখে গেছে। অবশ্য তুলি দিয়ে নয়, ধারালো পাথর দিয়ে কেটে। তারা কখন জানতই না যে, তাদের সেই আনন্দ-মুহূর্ত্তটুকু অক্ষয় ইতিহাসস্বরূপ আমাদের কাছে

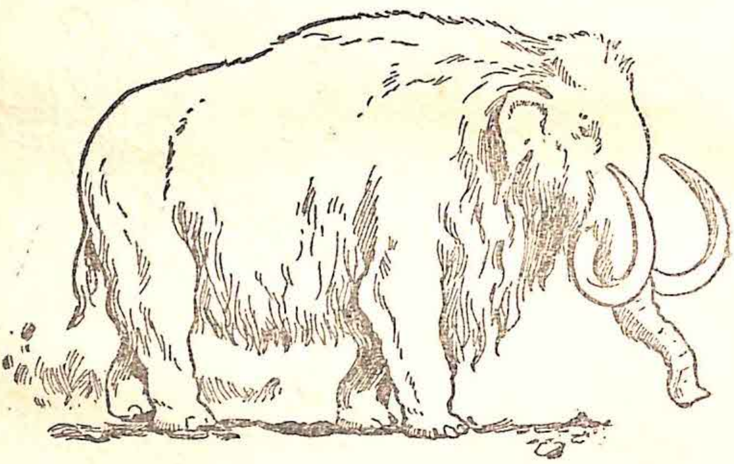


প্রাচীন মানবের গুহাগাত্রে আঁকা বাইসনের ছবি

তাদের সাক্ষ্য দেবে। আমরা সুদূর ভবিষ্যতে একদিন সেই অযত্নে ফেলে-যাওয়া ছবিখানিকে এত আদর করব।

কেবল এ থেকেই যে আমরা ম্যামথের চেহারাটা কেমন ছিল তা বুঝি না, কিছুকাল আগেও রুশিয়ায় সাইবেরিয়া অঞ্চলে বরফের নিচে ম্যামথের একটা সম্পূর্ণ শরীরও আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয়, হঠাৎ কোন ভারী জিনিষের চাপে তার দেহের মধ্যকার রক্তকোষগুলি ফেটে গিয়েছিল ; বরফের মধ্যে থাকায় তার কিছুই নষ্ট হয়নি।

ম্যামথগুলো ছিল একালের হাতীর চেয়েও বড়; তাদের কারো কারো দাঁত হ'ত লম্বায় আট হাত! তবে সব ম্যামথই যে আকারে বিশাল হ'ত, তা নয়। অনেক ম্যামথ আকারে ছোটও ছিল। ঐ যে সামনে সেকালের বন, বনের মাঝে খানিকটা জলা জায়গা। ঐ দেখ্, একপাল ম্যামথ শুঁড় দিয়ে পাইন, ফার, উইলো গাছের ডাল-পালা মড়্ মড়্ শব্দে ভেঙে খাচ্ছে। আবার দেখ্বি, এরা



ম্যামথ

ফুলফলও খায়। তার প্রমাণ, বরফের ভেতর যে দু'একটা ম্যামথকে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, তাদের দাঁতে এখনও ফলের বীজ লেগে আছে।

এই বনের পরে ঘাসে-ঢাকা একখানা প্রকাণ্ড মাঠ দেখ্তে পাবি। তার ওপর হয়ত একপাল কোয়াগা বা জেব্রা চরে বেড়াচ্ছে। এরা ঘোড়ার জাতি। কোন বিপদের গন্ধ পেলেই এরা আর এক মুহূর্ত্তও

ওখানে থাকবে না, ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুট্‌তে ছুট্‌তে মাঠের শেষে মিলিয়ে যাবে।

এখন পৃথিবীর কোথাও কোয়াগা নেই। কিন্তু কিছুকাল আগেও এদের কয়েক জায়গায় দেখা গেছে।

ঐ মাঠের পর হয়তো বন আছে। সে বনে দেখ্‌বি গাছপালার আড়ালে একপাল হাইপোহিপো—এরাও ঘোড়ার জ্ঞাতি—খুব গোপনে ডাল-পালা ছিঁড়ে খাচ্ছে। ভারী ভীরু এরা; সহসা বনের বাইরে আসে না; বনের আড়ালে আড়ালেই জীবন কাটায়। আকারে এরা ঘোড়ার চেয়ে অনেক ছোট।

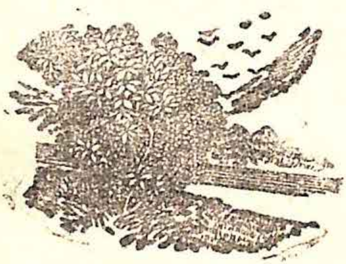
এ-সব ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে যা। হয়তো দেখ্‌বি এক জায়গায় বুনো গাধার পাল চরছে। গাধা বড় নিরীহ প্রাণী; ছুট্‌তে পারে না। বোঝা নিয়ে পথ দিয়ে নিতান্ত শান্তশিষ্টের মত চলে। মাঝে মাঝে তুলনাহীন স্থূলকণ্ঠে গান গেয়ে মনের বেদনা লোকসমাজে প্রচার করে থাকে। বেচারারা তখনও নিষ্কৃতি পায় না, অতি কঠোর তাড়নায় মনের বেদনা চেপে রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু বুনো গাধার মত জোরে ছুট্‌তে পারে এমন জন্তু খুব কমই আছে। এরাও ঘোড়ার জ্ঞাতি।

সেই যে অতীতের ফেনোকোডাস, যুগে যুগে সে কখনও হয়েছে হিরাকোথেরিয়াম, কখনও হয়েছে ইওহিপাস। এমনি করে সে বর্ত্তমান ঘোড়ার আকার পেয়েছে।

এখনকার ঘোড়ার মত সুন্দর চতুষ্পদ প্রাণী খুব কমই দেখ্‌তে পাবি। এদের কবে মানুষ বশীভূত করে নানা কাজে লাগিয়েছিল, তা বলা কঠিন। তবে এ প্রাণীটা বড় উপকারী, এটার সাহায্যে

নানা রকম কাজ করা যায়, এ-কথা আদিম মানুষেরা সহজেই বুঝেছিল। আর তাদের সেই জ্ঞানের ফল আমরা আজ পরিপূর্ণভাবেই ভোগ করছি।

এখানে একটা কথা ব'লে রাখ্ছি। এই যে নানা রকমের দৃশ্য, নানা যুগের পশুপাখী তোরা দেখ্ছিস্, এরা কিন্তু কোনও একটি বিশেষ দেশের পশুপাখী নয়। সারা দুনিয়ার নানা জাতের আর ভিন্ন যুগের পশুপাখী তোদের দেখাচ্ছি। যতটা সম্ভব পর পর যুগের দৃশ্য দেখাচ্ছি; তবে, সমসাময়িক দৃশ্যও বিভিন্ন জায়গায় দেখ্ছিস্।"



ত্রয়োদশ অধ্যায়

হিমের যুগের শেষ

"আমরা অতীতের সেই বনের ধারে এখনও দাঁড়িয়ে আছি। শুনতে পাচ্ছিস্, বাঘ ডাক্‌ছে।

ঐ দেখ্, একটা প্রকাণ্ড শ্লথ, যেন ছোটখাট শুঁড়হীন হাতী, গাছের গোড়ায় বসে উঁচু ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। বাঘের ডাক শুনে শ্লথটা চমকে উঠ্‌ল; ঐ যে পালাচ্ছে। বাঘগুলো এদের মাংস খেতে ভালবাসে।



মাইলোডন

কিন্তু এত বড় শরীর টেনে নিয়ে ছুটে পালানো সোজা কথা! ঐ শোন গাছ-পালার শব্দ। বাঘটা ওর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়েছে।

ঐ যে গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে বাঘটাকে দেখা যায়; ওপরের দু'টো দাঁত যেন দুখানা ছোট খড়গ। ভাগ্যে এ-যুগের পর এদের বংশ আর থাক্‌বে না, ধরাপৃষ্ঠ থেকে নির্ম্মূল হয়ে যাবে। তাই বলে

পৃথিবী কিন্তু হিংস্র প্রাণিশূন্য হবে না। সিংহ, নেকড়ে, হায়েনা, ভল্লুক সদম্ভে পৃথিবীর বনে বনে রাজত্ব করে বেড়াবে।

এই শ্লথদের এক জাতি আছে, তার নাম মাইলোডন। এরাও আকারে ছোট নয় ;—দেখ্‌লে মনে সম্ভ্রম জাগে।

মাইলোডনগুলো ছিল সেকালের আদিম মানুষদের খাদ্য-বিশেষ। আজকাল যেমন অনেকে ছাগল, মুরগী ও হাঁস পোষে, শেষে একদিন পালিতদের ওপর থেকে সব মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে তাদের কেটে খায়, সে-যুগের মানুষেরাও এমনি করে ঘাস-জল দিয়ে মাইলোডন পুষে তাদের বধ করে একদিন মহানন্দে ভোজ লাগিয়ে দিত।

এ অবশ্য অনেক পরের কথা।

কেবল যে এদের মাংসই তাদের খাদ্য ছিল, তা নয় ; রক্ত, চর্ব্বি, এমন কি, হাড়ের ভেতর যে মজ্জা থাক্‌ত, তাও তারা পাথর দিয়ে ভেঙে বার করে খেত।

এ বনে তো আর কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ; চল্‌, আরও দূরে চলে যাই।

কিন্তু কোথায় যেন কুকুর ডাক্‌ছে বলে মনে হচ্ছে না ? তাই তো! বুনো কুকুরের পাল বেরিয়েছে ; এখনই এ-ধারে আস্‌বে। বোধ হয়, কোন হরিণের পিছনে ধাওয়া করেছে।

এ-যুগে এক-একটা হরিণও কম বড় হ'ত না, ষাঁড়ের মতো উঁচু। বর্ত্তমানের মূজ হরিণের মাথায় যেমন ডালওয়ালা প্রকাণ্ড শিঙ থাকে, তাদের মাথাতেও তেমনি ডালপালাওয়ালা শিঙ থাকত।

ঠাকুরদা সকলকে নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে চল্‌লেন।

সাম্‌নে প্রকাণ্ড মাঠ; তার ওপর দিয়ে একপাল বুনো বাইসন চলেছে। তাদের শিঙ দেখলে বুক কেঁপে ওঠে—এ-শিঙের আগা থেকে ও-শিঙের আগা অন্তত ছ' হাত। বাইসনগুলোর চোখ দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছে। ঐ যে ওরা মাঝে মাঝে এদিক্-ওদিক্ তাকাচ্ছে। ওদের মাথা থেকে ঝাঁকড়া লোম চোখের ওপর অবধি এসে চেহারাটা আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

এরা মাঠে মাঠে ঘাস খেয়ে বেড়ায়। সাহস করে কেউ এদের কাছে ঘেঁসে না। কিন্তু সে-যুগের মানুষ এদের শিকার করত। অবশ্য আমাদের বর্ত্তমান যুগের অসভ্য জাতিরাও বাইসন শিকার করে বাইসন-বংশ নির্ম্মূলপ্রায় করে তুলেছে।

বাইসন শিকার তাদের একটা ভয়ানক ব্যাপার ছিল। অস্ত্রের মধ্যে তো পাথরের তীক্ষ্ণধার বল্লম, বড় বড় পাথরের ধারালো ঢিল। তাই দিয়ে তারা বাইসন,—কেবল বাইসন কেন,—বড় বড় ম্যামথ, ভল্লুক, বাঘ প্রভৃতি শিকার করত।

এই ঘটনাকে সে-যুগের চিত্রশিল্পীরা গুহাগাত্রে এঁকে মানব-সমাজে চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছে।"

বাইসনগুলো মাঠের একধারে চলে গেলে অনেকটা গরুর মত দেখতে এক পাল প্রাণী ছুটে এল। তাদের পিছনে কয়েকটা নেক্‌ড়ে বাঘ।

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"ও জন্তুগুলো গরুর পূর্ব্বপুরুষ। এক-একটা আকারে কত বড় দেখ্‌ছিস? যেন হাতী! এ-যুগের এরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র আছে।"

সকলে চল্‌তে চল্‌তে মাঠ ছাড়িয়ে আবার এক বনে এসে

পড়ল। বনের ধারে এক জায়গায় একটা অদ্ভুত প্রাণী, যেন প্রকাণ্ড একটা কাছিম আস্তে আস্তে চলাফেরা করছে! কি বিশ্রী চেহারা! ইনি গত যুগের গ্লিপ্টোডনের জ্ঞাতি, বর্ত্তমানের আর্ম্মাডিলোর পূর্ব্ব-পুরুষ; শরীরটা হবে বোধ হয় মণ-দশেক ভারী।

সকলে বল্লে—"ঠাকুরদা, এতদিনেও একটা জিরাফকে দেখা গেল না তো!"

"তাই নাকি? সাম্নের দিকে তাকিয়ে দেখ্ত ঐ গলাটা কিসের?"

"জিরাফের। কিন্তু ওর মাথায় পাঁচটা শিঙ?"

"সেকালের জিরাফের তাই ছিল; তুষার-যুগে এরা ছাড়া আরও কত রকমের প্রাণী পৃথিবীতে ছিল।

আত্মরক্ষা করবার জন্যে ও খাবারের সন্ধানে তারা তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশ ছেড়ে নানা দিকে চলে যায়। এর ফলে, অনেকেই জ্ঞাতি-বর্গের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

যারা শুক্নো জায়গায় বাস করত, তারা হয়তো বাধ্য হয়ে জলাশয়ের তীরে আশ্রয় নিয়েছিল; যারা সমতলভূমিচারী ছিল, তারা হয়ে উঠেছিল পার্ব্বত্য। ক্রমে এদের আকৃতি, গায়ের রঙ কিছু কিছু গিয়েছিল বদ্লে।

তখন কেবল যে প্রাণিজগতেই পরিবর্ত্তন চল্‌ছিল তা নয়, পৃথিবীর ভূভাগও নানা জায়গায় বদ্লে যাচ্ছিল। যেখানে সমুদ্র ছিল, সেখানে হল ডাঙা; যেখানে ডাঙা ছিল, সেখানে দেখা দিল সমুদ্র।

আজ যে-সব জায়গায় উত্তপ্ত শুষ্ক ভীষণ মরুভূমি বিস্তৃত, সেকালে

সেখানে কোথাও ছিল বন, কোথাও ছিল সমুদ্র। কালক্রমে সেখান থেকে নানা কারণে সমুদ্র সরে গেল, বন গেল শুকিয়ে। সেই সিক্ত লবণাক্ত ভূভাগে, সেই বনপ্রদেশে কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে মরুভূমি জেগে উঠল।

সেইজন্য মরুভূমির মধ্যে প্রস্তরীভূত প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া যায়। তার সাক্ষ্য মধ্য-এশিয়ার গোবী মরু।

ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত তখনও থামে নি; মাঝে মাঝে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতি ছিল চব্বিশ ঘণ্টায় একবার। চাঁদ সে সময়ে দূর আকাশে উঠে গেছে। ঠিক আজকের মতোই সেদিন পূর্ণিমা হত, আবার একদিন অমাবস্যা আসত।

এই তুষার-যুগে বহু প্রাণী ধ্বংস হয়ে গেল,—কেউ শীতে, কেউ খাদ্যাভাবে, কেউ জলে ডুবে, কেউ হিংস্র প্রাণীর মুখে, কেউ বা দারুণ বরফের চাপে পিষ্ট হয়ে।

কিন্তু এই দারুণ দুঃসময় পৃথিবীর উপর খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। আমাদের এই বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়ার অবস্থা দেখে, তোরা নিশ্চয়ই কতকটা অনুমান করতে পারছিস্। হিম-যুগ এসেছিল পৃথিবীর উত্তর-ভাগে; সেইজন্যে ওখানকার আবহাওয়া এখনও শীতল। দক্ষিণেও একেবারে প্রান্তভাগে এখনও দারুণ শীত। এ ছাড়া, পৃথিবীর বিষুব-রেখায় সূর্য্যের তাপ প্রখর বলে এদিকে শীতের বুড়োটা বেশীদিন আসর জমাতে পারে নি। অবশ্য সেই হিম-যুগের তুলনায় উত্তর-ভাগের শীত এখন অনেক কম।

শীতটা যেমন একদিন একরকম হঠাৎ এসেছিল, চারধার বরফে-

আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, তেমনি আবার একদিন এই সীমাহীন তুষাররাশি গল্‌তে শুরু করলে, পৃথিবীর আবহাওয়ার উত্তাপ বেড়ে চল্‌ল। তারপর থেকে এই উত্তাপ বেড়েই চলেছে।

সেই শীতের প্রারম্ভটা যেমন ভয়ানক হলেও তার মধ্যে সৌন্দর্য্য ছিল, তেমনি যখন বরফ গল্‌তে শুরু করেছিল, তখনকার অবস্থাটাও ছিল বড় সুন্দর।

সে সময়ের কল্পনা কর,—তুষার-রাশি একটু একটু করে গল্‌তে শুরু করেছে; চারধারে অসংখ্য ঝরণা চঞ্চল শিশুদলের মতো জেগে উঠে ঝর্ ঝর্ শব্দে ছুটে চলেছে; কত নিস্তরঙ্গ কঠিন হ্রদ, নদী, জলাশয় যেন বহুকালের নিদ্রাশেষে একটু একটু পাশ ফিরছে, কোথাও একটু তরঙ্গ উঠছে, কারো বুকের কঠিন তুষারাবরণ ভীষণ বা সুমধুর শব্দে ফেটে যাচ্ছে; যে-সব তৃণপূর্ণ মাঠ এতকাল ঢাকা পড়ে ছিল, সাদা তুষারের মধ্য থেকে তাদের তৃণদলের পাতলা পাতাগুলি আলোকের দিকে মহানন্দে হাত বাড়িয়েছে; গভীর বনানীর ওপর থেকে তুষারের যবনিকা একটু একটু খসে পড়ছে; যে-সব গাছে ফল ছিল, ফুল ছিল, এতদিনে যেগুলি তুষারাবরণে ঘুমিয়ে ছিল, এখন সেগুলিকেও দেখা যাচ্ছে। সেই ফল, ফুল, কুঁড়ি, কিছুই নষ্ট হয় নি।

এই সময়ে আবার পশু-পাখীর মাঝে মহা-চঞ্চলতা দেখা দিল;—চারধারে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। আবার তার সঙ্গে একটু দুঃখও ছিল বৈ কি! দীর্ঘকালের একটা অভ্যাস, দীর্ঘদিনের বাসভূমি, ভাল হোক্ মন্দ হোক্, ছাড়তে মনে বড় বেদনা লাগে। তারা সকলে দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে এদিকে-ওদিকে চলে যেতে আরম্ভ করল।

চারধারে তাকিয়ে দেখ্, যেখানে হিম-যুগে ছিল ডাঙা, সেখানে হল জলরাশি ; যে জলাশয়গুলো ছিল অগভীর, সেগুলো হয়ে উঠল গভীর। উত্তর-ভাগের দৃশ্য আরো বদ্‌লে গেল। তবে তা একদিনে নয়, দু' দশ বছরেও নয়।

হিম-যুগের প্রকোপ মাঝে মাঝে অন্তত চারবার বেড়েছে, কমেছে। এই পরিবর্ত্তন আজও চল্‌ছে।

সেই সময় থেকে, বলা উচিত সেই হিম-যুগ থেকেই প্রাণিজগতে ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাসস্থান-পরিবর্ত্তন চল্‌ছে। এরই সঙ্গে যোগ রেখে সমানে চল্‌ছে তাদের আকৃতির পরিবর্ত্তন।

আমরা বহুকাল ধরে দেখে আস্‌ছি, শীতের শুরুতে শরতে বা হেমন্তে এবং শীতের শেষে বসন্তে বা গ্রীষ্মে প্রাণিজগৎ নীড় রচনার কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ; তখনই তাদের ডিম পাড়ার বা ছানা হবার সময় হয়।

শীতের সময় এ দুটি কাজের অসুবিধা। সেই থেকে ঐ ব্যাপারটা প্রাণীদের প্রকৃতিগত গুণে দাঁড়িয়ে গেছে।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

আদি মানব—লাঙ্গুলহীন বানর

"এবার সেই আদিকালের মানবজাতির গল্প শোন্—

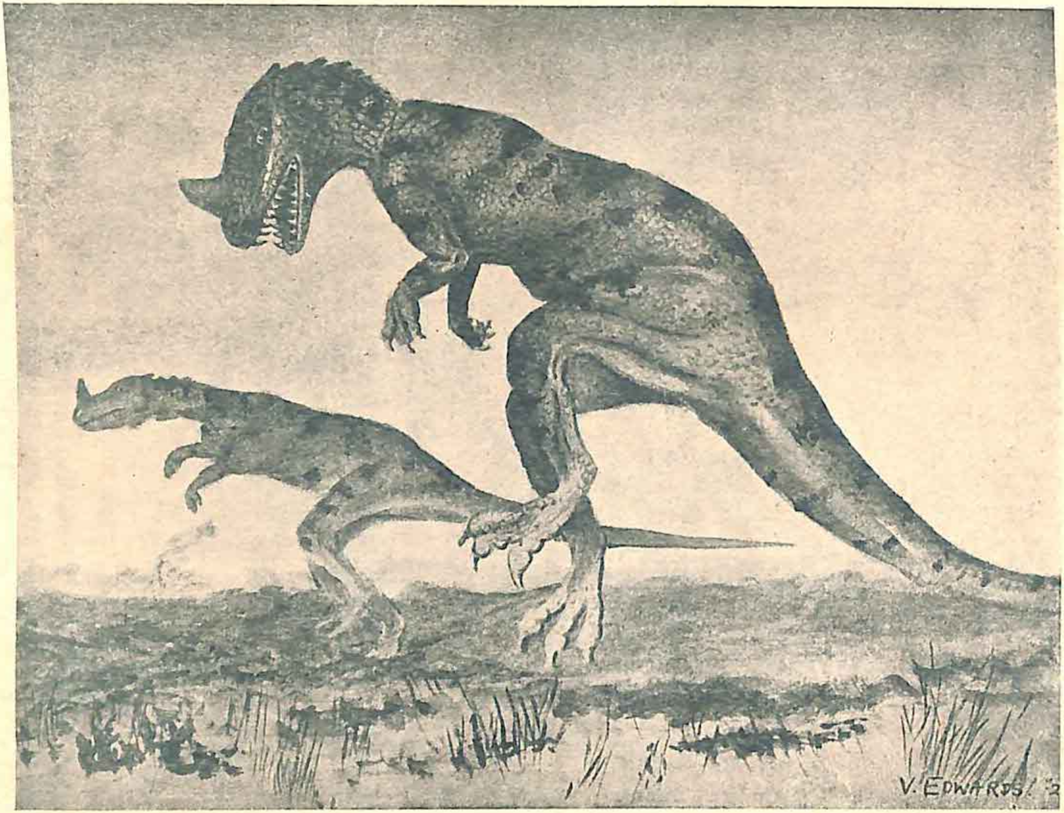
সব প্রাণী, সকল উদ্ভিদেরই প্রথম সৃষ্টি জলে এ তোরা দেখেছিস্। জল থেকেই তারা সকলে ক্রমে ডাঙায় উঠে চারধারে ছড়িয়ে গেছে।

মানুষেরাও যে প্রথমে জলের অতিক্ষুদ্র পোকা, তারপর খোলস-ধারী প্রাণী, তারপর মাছ, তারপর উভচর, তারপর ডাঙায় সরীসৃপ, তারপর স্তন্যপায়ী জীব, তারপর লাঙ্গুলহীন ভূচর বানর-জাতীয় প্রাণীর অবস্থা থেকে কালে কালে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান যুগের অবস্থায় এসে পৌঁছেচে, এ কথাও তোরা আগে কিছু শুনেছিস্।

আমার কথায় তোদের ধারণা হতে পারে যে, মানুষ ঠিক বানর থেকে উৎপন্ন হয়েছে; অর্থাৎ মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর।

এতে তোদের অনেকেরই আপত্তি থাকতে পারে। আবার মানুষ যে চিরকালই ঠিক এমন সুন্দর ও বুদ্ধিমান প্রাণী ছিল তাও কিন্তু নয়। পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যা কিছু দেখ্‌ছি, সবই 'ক্রম-বিবর্ত্তনের' ফলে এমন হয়েছে।

পৃথিবীতে সেই আদিতে যা ছিল, তা দেখেছিস্; আর এটাও একরকম বলেছি যে, হঠাৎ কিছুই সৃষ্ট হয় নি এবং কখন হতে পারে না। একটা প্রাণী সৃষ্ট হয়েছে, তারপর নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবনের পথে চলে তা ভিন্নরূপ ধারণ করেছে।



টাইরানোসরাস

মানুষ যে স্তন্যপায়ী প্রাণী, এ কথা তোরা সকলেই জানিস্।

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত—কেউ মাংসাশী, কেউ উদ্ভিদ্‌ভোজী, কেউ দন্তুর (যেমন ইঁদুর, বিভার)।

এদের মধ্যে আবার প্রধান সলাঙ্গুল ও লাঙ্গুলহীন বানর। এদেরও মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। পণ্ডিতেরা নানা দিক্ থেকে বিচার করে স্থির করেছেন, মানুষের আদিপুরুষ লাঙ্গুলহীন কোনও বানর-জাতীয় জীব।

তাই বলে ঐ গাছে যে-সব বানর বসে আছে, বা পৃথিবীতে এখন যে-সব লাঙ্গুলহীন বানর দেখা যায়, তারাই যে মানুষের আদি পুরুষ, আর তা থেকেই মানুষের উৎপত্তি হয়েছে, তা নয়।

যে লাঙ্গুলহীন স্তন্যপায়ী বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে, তারা কিন্তু এখন কেউই পৃথিবীতে বেঁচে নেই, আর তাদের কারো দেহাবশেষ যে আবিষ্কার করা গেছে তাও নয়। পণ্ডিতেরা সারা পৃথিবীতে পাহাড়ের গুহায়, শুষ্ক প্রাচীন নদীগর্ভে, পর্ব্বতকোলে, মরুভূমিতে, এমনি নানা জায়গায় তার অনুসন্ধান করছেন।

যে লাঙ্গুলহীন স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়, তারা ঠিক বানর নয়, মানুষও নয়।"

অশোক জিজ্ঞাসা করলে—"সেই প্রাণীটা থেকে যে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে একথা কেন বল্‌ছ? তার কোন প্রমাণ আছে?"

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"প্রমাণ? হাঁ, তা কিছু কিছু আছে বৈ কি! ঐ দেখ্, ঐ বটগাছটার ওপর কয়েকটি বানর বসে আছে। তোরা তো সকলেই চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেছিস্। সেখানেও নানা রকমের বানরের মেলা দেখেছিস্। তাদের হাবভাব, মুখ-চোখের

আকৃতি, শরীরের গড়ন, বুদ্ধি-সুদ্ধি দেখে, বোধহয় মনে হয়েছে, ওরা অনেকটা তোদেরই মতো—"

ছেলেরা সকলে গোলমাল করে উঠ্‌ল—"আমার মতো নয়।"

ঠাকুরদা বল্‌লেন—"আচ্ছা, তোদের কারো মতো নয়, মানুষের মতো। এ-তো জীবন্ত বানরগুলোর কথা বল্‌ছি। আবার যদি কোন বানরের কঙ্কাল মানুষের কঙ্কালের পাশে রাখা যায়, তাহলে তাদের কোন্‌টা মানুষের কোন্‌টা বানরের দেখে চেনা কঠিন।

আবার দেখ্‌ বানরমাতার সন্তানের প্রতি যে স্নেহ, সন্তানকে সে যে-ভাবে বুকে করে নিয়ে বেড়ায়, দুধ দেয়, তার মাথা ও গা থেকে বসে বসে যে-ভাবে উকুন বাছে, তা দেখ্‌লে কি মনে হয় না যে, ও কাজগুলো সে ঠিক মানুষের মতোই সম্পাদন করছে? রাগ করিস নি, বানর-শিশুর চঞ্চলতা ও খেলা-কৌতুকের সঙ্গে তোদেরও চঞ্চলতা ও খেলা-কৌতুকের বেশ মিল। তাই নয় কি?"

ছেলেরা অনিচ্ছার সঙ্গে বল্‌লে—"হাঁ—"

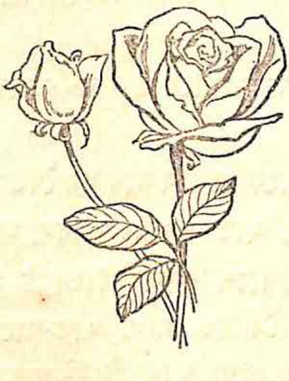
ঠাকুরদা বলে যেতে লাগ্‌লেন—"বানরের বুদ্ধির কত রকমের প্রমাণ পাওয়া যায়। বানর শিক্ষা পেলে কামান ছুঁড়তে পারে, মোটর-সাইকেল চালায়, নিজেরাই টেবিলের ওপর চাদর বিছিয়ে চা ও খাবার খায়, সিগারেট টানে, কোন কোন বানর আবার পেণ্টুলুন পরে সাহেব সাজে। অনেক দুষ্ট লোকে বানর পুষে তাকে দিয়ে চুরি করায়। এসব বিষয়ে আর কোন্‌ প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তুলনা চলে?

অবশ্য সলাঙ্গুল বানরের চেয়ে লাঙ্গুলহীন বানর—যেমন শিম্পাঞ্জী,

গরিলা, ওরাঙওটান্ আর গিবনের (উল্লুকের) সঙ্গেই মানুষের সাদৃশ্যটা বেশী।

গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাঙওটান্, গিবন বানরের শ্রেণীভুক্ত—একথা শুনে তোরা হয়তো আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিস্।

কিন্তু মিলিয়ে দেখা গেছে, সলাঙ্গুল বানরের সঙ্গেই এদের মিল খুব বেশি, আর কোন প্রাণীর সঙ্গে নয়। প্রাণিজগতে মানুষের বানরের সঙ্গে যতটা মিল আবার বানরের মানুষের সঙ্গে যতটা সাদৃশ্য এত আর কোন প্রাণীর সঙ্গে নয়।"



পঞ্চদশ অধ্যায়

গরিলা

"আগে শোন্ গরিলার কথা।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে গভীর জঙ্গলে গরিলাদের বাস। ঐ জায়গা ছাড়া আফ্রিকা বা পৃথিবীর আর কোথাও গরিলা বাস করে না।

এ জঙ্গল এমন গভীর ও দুর্গম যে ঢুকতে ভয় করে। দিনের বেলাতেও এর তলায় অস্পষ্ট অন্ধকার লেগে থাকে। এখানকার বাতাসও বড় অস্বাস্থ্যকর। জঙ্গলের জায়গায় জায়গায় জলাভূমি ; সেজন্যে মাটি বড় সরস, গাছপালাও সতেজে বাড়ে। আবার মশারও বড় উৎপাত।

বানরজাতির মধ্যে আকারে ও বলে-বিক্রমে গরিলার সমান আর কেউ নেই।

এক একটা গরিলাকে দেখলে মনে হয় দৈত্য। বুকের ছাতিখানা বিশাল ও পেশীযুক্ত, হাত দুখানা মাংসল, মাথাটা প্রকাণ্ড, দাঁতের সারি তীক্ষ্ণ, মুখের দুপাশে 'কুকুরে'-দাঁতদুটো লম্বা, গায়ের রঙ ঘোর কালো, চোখ দুটো টকটকে লাল, হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো মোটা মোটা, নাকও মোটা ও চাপা, কানদুটো কিন্তু মানুষের কানের মতো। সারাগায়ে কালো ঘন লোম ; কারো লোম আবার একটু লালচে। বুড়ো গরিলার মাথার চুল মানুষের চুলের মতো পেকে যায়—"

নাতনীরা জিজ্ঞাসা করলে—"ওদের মেয়েরাও কি ঐ রকম ভয়ঙ্কর দেখ্‌তে ?"

ঠাকুরদা হেসে বল্‌লেন—"না। তোদের মতো ফুট্‌ফুটে।"

"সত্যি ?"

"না। ওদের মেয়েরা পুরুষের মতো বড় ও কুৎসিত দেখ্‌তে নয়—তাই বলে সুন্দরীও নয়।

প্রাণীগুলো বড় নির্জ্জনতাপ্রিয় ; মেজাজও ঠাণ্ডা। এক একটি গরিলা-পরিবার জঙ্গলের মাঝে এক এক জায়গায় বাস করে। বানর হলেও এরা গাছে চড়তে ওস্তাদ নয় ; সারাদিনই খাবারের চেষ্টায় এদিকে-ওদিকে মাটিতে ঘুরে বেড়ায়। কখন কখন ফল পাড়বার জন্যে গাছে চড়ে। কিন্তু মাটিতে এরা সোজা হয়ে চল্‌তে পারে না, চতুষ্পদের মত চার হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে একটু লাফিয়ে চলে। আবার একেবারে যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাও নয় ; একটু সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ায়। এদের খাদ্য হল গাছ-পালার কচি কচি ডাল ও পাতা এবং ফল-মূল। এইসব খেয়েই এদের গায়ে এত জোর যে, একটা ঘুষিতে মানুষের মাথার খুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেল্‌তে পারে, বন্দুকের নলও দাঁত দিয়ে চিবিয়ে লোহার পাত করে দেয়। গাছের দশ-বারো ইঞ্চি মোটা ডাল ভেঙ্গে ফেলা এদের কাছে কিছুই নয়।

এরা রাগলে, পালোয়ানের মতো বুকের ওপর ধম্ ধম্ শব্দে ঘুষি মারে, আর গাঁক্ গাঁক্ শব্দে গর্জ্জন করে। সে হুঙ্কার বহুদূর থেকে শোনা যায়। এরা কোথায় রাত কাটায় জানিস্ ? রাতে হলে পরিবারের যে কর্ত্তা সে থাকে গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে ; আর

তার স্ত্রী থাকে গাছের ডালে ছেলে-পুলে নিয়ে। ছেলেদের এরা খুব সাবধানে রাখে। কেননা, তাদের শত্রু হল, চিতাবাঘ।

চিতারা গরিলার ছোট ছোট ছানার রক্ত-মাংসের লোভে আস্তানার চারধারে খুব গোপনে ঘুরে বেড়ায়। সুবিধা পেলে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে নিয়ে তীরবেগে গভীর বনে চম্পট দেয়। অবশ্য সেই সময় অনেক চিতাকেও গরিলার হাতে প্রাণ হারাতে হয়। যদি একবার কোন রকমে গরিলা তাকে ধরতে পারে, তাহলে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে, দুহাতে চট্‌কে অমন সুন্দর শরীরের আর কিছু চিহ্ন রাখে না।

গরিলা শিকার করা বড় কঠিন।

গরিলার কাছে সিংহ, হাতী, গণ্ডারও কিছু নয়। যে বনে গরিলার বাস সে বনে এরা কেউ সহসা ঘেঁসে না, দূর থেকেই নমস্কার করে পালায়।

কিন্তু এমন ভয়ংকর প্রাণীকেও আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা শিকার করে থাকে। কেবল তাই নয়; তারা ভাবে, যে গরিলা শিকার করে নি, তার জীবনই বৃথা। গরিলার মাংস ঐ সব অসভ্যদের একটি প্রিয় খাদ্য।

তবে অমন একটা ভয়ংকর প্রাণীকে শিকার করতে গিয়ে সকলেই যে অক্ষত দেহে ফিরে আসে, তা ভাবিস্ নি; এদের অনেককেই গরিলার হাতে প্রাণ হারাতে হয় বা অনেকেই সারা জীবনের মতো অঙ্গহীন হয়ে পড়ে।"

একজন নাতনী জিজ্ঞাসা করলে—"ঠাকুরদা, তুমি বলছ গরিলার মেজাজ ঠাণ্ডা। তবে কেন তাকে শিকার করা অমন সাংঘাতিক ব্যাপার?"

"কেন বল্‌ছি শোন্‌।

প্রথমতঃ এরা যেখানে বাস করে, সেখানে গহন বন ও তার তলায় অন্ধকার। সেইজন্যে কোন গরিলা আট-দশ হাতের মধ্যে এসে পড়লেও লক্ষ্য ঠিক করা কঠিন। আবার একবার যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তো শিকারীর অনিবার্য্য মৃত্যু। বন্দুকে গুলি পোরবার আর সময়ই থাকে না।

গরিলার মেজাজ ঠাণ্ডা; কিন্তু ক্রুদ্ধ হলে, বাঘ-সিংহও তার বিক্রমের কাছে কিছু নয়। চক্ষের পলকে সে শিকারীকে আক্রমণ করে।"



ষোড়শ অধ্যায়
শিম্পাঞ্জী—ওরাংওটান্—উল্লুক

"এবার শোন্ শিম্পাঞ্জীদের কথা।

শিম্পাঞ্জীরাও গরিলাদের মত আফ্রিকাবাসী। গরিলারা যে অঞ্চলে থাকে শিম্পাঞ্জীরাও সেদিকে বাস করে।

অনেককাল আগে লোকে শিম্পাঞ্জীকে গরিলা বলে ভুল করত। অথচ শিম্পাঞ্জীদের আকার বিশেষ বড় নয়, আর গরিলাদের মত ওরা অমন কুৎসিত ও ভীষণ-দর্শনও নয়। তাছাড়া, শিম্পাঞ্জীরা ভারী আমুদে, ঠিক তোদের মতো।

হয়তো ভাব্ছিস্, রাস্তায় যে-সব রোগা ও ক্ষুদে বাঁদরগুলো খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, শিম্পাঞ্জীরা ঠিক তাদের মতো ছট্‌ফটে আর ছোট। তা নয়। শিম্পাঞ্জীরা খুব হৃষ্টপুষ্ট, শরীরেও বেশ শক্তি রাখে, হাত-পাগুলোও লম্বা। তবে ওরা সাধারণতঃ আড়াই হাতের বেশী লম্বা হয় না। ওরাও বড় নির্জ্জনতা ভালবাসে; মানুষ দেখ্‌লে চট্ করে বনের আড়ালে সরে যায়। কিন্তু রাগলে আর জ্ঞান থাকে না। তখন গরিলার মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

এরা গাছের ওপর বাস করে, সোজা হয়েও দাঁড়াতে পারে। এদের খাদ্য হচ্ছে, গরিলাদেরই মতো ফল-মূল, কচি পাতা ও ছোট ছোট রসকোমল ডাল। এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে গরিলাদের জীবনযাত্রার বেশ মিল দেখা যায়। এরাও গরিলাদের মতো এক

একটি পরিবার পৃথক্ পৃথক্ জায়গায় বাস করে; আর সে পরিবারের কর্ত্তা হচ্ছে পুরুষ।

আফ্রিকার জঙ্গলে চিতাবাঘের ভারী উৎপাত। শিম্পাঞ্জী-শাবকও চিতার একটি প্রিয়খাদ্য। সেইজন্যে শিম্পাঞ্জীরা ছানাদের খুব সাবধানে রাখে, আর সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, যাতে চিতাবাঘ তাদের এলাকার ত্রিসীমানায় না আস্তে পারে।

বানরজাতির মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান হল—শিম্পাঞ্জী। শিক্ষা দিলে এরা কতকগুলো কাজ ঠিক মানুষের মতো সম্পন্ন করতে পারে। দু' একটি দেশে শিম্পাঞ্জীকে পুষে তাদের মোটর-সাইক্‌ল চালানো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

এক সাহেবের একটা মেয়ে-শিম্পাঞ্জী ছিল। সে দশ অবধি গুণ্‌তে পারত; তবে ছয় অবধি গুণ্‌তে তার ভুল হত না।

তাকে যদি বলা হত—"দুটো খড় দাও, চারটে খড় দাও, কি ছটা খড় দাও"—তাহলে সে তার খাঁচা থেকে সেগুলো তুলে এনে হাতে দিত। সে সাদা রংও চিনতে পারত।

আবার অনেক সময় শিক্ষা না দিলেও শিম্পাঞ্জীরা মানুষের মতো উঁচু ডাল বা জায়গা থেকে লাঠি বা ডাল দিয়ে অথবা কতকগুলো পাথর বা বাক্স ওপর ওপর রেখে তার ওপর দাঁড়িয়ে ফল বা খাদ্য পেড়ে খেতে পারে।

একটা শিম্পাঞ্জী ছিল, সে পিঁপ্‌ড়ে খেতে ভালবাস্‌ত; বোধ হয় পিঁপ্‌ড়ের টক্ রসের জন্য।

তার খাঁচার বাইরে দিয়ে কোন পিঁপ্‌ড়ে গেলে, সে প্রথমে হাত

বাড়িয়ে সেটাকে ধরবার চেষ্টা করত। তা সম্ভব না হলে কাঠি দিয়ে সেটাকে টেনে এনে খেয়ে ফেল্‌ত।

শিম্পাঞ্জীরা শিক্ষা পেলে পেয়ালা থেকে চুমুক দিয়ে চা খেতে পারে। অথচ বানরজাতি তরল জিনিষ খাবার সময় প্রথমে তাতে হাত ডুবিয়ে দেয়। তারপর হাত তুলে নেয়। তাতে হাতে যেটুকু লাগে সেটুকু চেটে খায়। জল খাবার সময়ও ওরা এরকম করে চেটে চেটে খেয়ে থাকে।

সিনেমার ছবিতে, সার্কাসে শিম্পাঞ্জীরা কি রকম মানুষের মতো খেলা দেখায়, তা বোধহয় তোরা দেখেছিস্।

এবার ওরাঙওটান্‌দের কথা—

ওরাঙওটান্‌দের খুঁজতে হলে আফ্রিকায় যেতে হবে না; এরা থাকে সুমাত্রা ও বোর্ণিওর গভীর জঙ্গলে। শোনা যায়, আমাদের এই ভারতবর্ষেও নাকি শিম্পাঞ্জী ও ওরাঙের কয়েকটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে।

কথাটা বড় আশ্চর্য্যের! শিম্পাঞ্জী আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের জঙ্গল ও ওরাঙওটান্ বোর্ণিও ও সুমাত্রার বন ছাড়া পৃথিবীর আর কোথায়ও বাস করে না। অথচ ভারতবর্ষের মাটিতে ওদের কঙ্কাল পাওয়া যাবে, এ কি-রকমের কথা? ভারতবর্ষ ও ঐ তিনটি দেশের মধ্যে দুস্তর সাগর। তবে কি করে ঐ প্রাণীগুলো এখানে আসতে পারে?

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, সুদূর অতীতে এই তিনটি দেশ যুক্ত ছিল।

এদের বনে যে-সব প্রাণীর বসবাস করত, তারা স্বচ্ছন্দে এদেশে-

ওদেশে চলাফেরা করত। কালক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই ভূভাগ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, এদের প্রাণিগণও পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তারপর থেকে আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে, কেউ আজও টিকে আছে, কেউ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ওরাঙদের চেহারা অতি কদাকার। দুহাত, আড়াই হাতের বেশি লম্বা হয় না। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে আকারে একটু ছোট।

ইহারা ওজনে বেশ ভারী। হাত দুখানা আগুল্ফ লম্বিত, মাথাটা মস্ত, পা দুখানা ছোট, নাকটা বড়, কপালখানা চওড়া, কান দুটো মানুষের কানের মতো; কান ছাড়া এদের আরও একটা জিনিষ ভোগী মানুষের মতো দেখ্‌তে। সেটা হচ্ছে—বিশাল ভুঁড়ি। ঐ ভুঁড়ির জন্যে এদের দেখ্‌লে মনে সম্ভ্রম জাগে।

ওরাঙদের গায়ে খুব লম্বা লোম থাকে; গা ও লোমের রং সাধারণতঃ লাল্‌চে। এই চেহারার ওপর আবার মুখে একটু দাড়ি।

এরা হল শাখাবাসা জীব। মাটিতে বড় একটা নামে না। নামলেও চল্‌তে কষ্ট হয়; চারপায়ের ওপর ভর দিয়ে ধীরে চলে। আবার গাছেও চড়ে বড় ধীরে। দেখলে মনে হয় বড় গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতির এবং বড় সাবধানী।

এদেরও খাদ্য হল ফল-মূল, ডাল-পাতা। কিন্তু শিক্ষা দিলে মাছ-মাংস, ডিম ও চা খেতেও অভ্যস্ত হয়।

ওরাঙরাও বড় নির্জ্জনতা-প্রিয় প্রাণী। এক একটি ওরাঙ-পরিবার

নিজেদের মত ঘর-করণা পেতে এক একটি জায়গায় পরম নিশ্চিন্ত মনে বাস করে।

খাবার যা যোগাড় করে তাও পরম আলস্য-ভরে। এদের খাবার সময় হল দুপুর বেলা। তার আগে খাওয়া-দাওয়া বড় পছন্দ করে না।

ওরাঙরা বড় নিরীহ প্রাণী। মানুষের, কেবল মানুষের কেন, সাধারণতঃ কোন প্রাণীরই সাতে-পাঁচে থাকে না। তবে এদের একটা দুর্ব্বলতা আছে। কুমীর বা অজগর দেখলেই ক্ষেপে যায়। লম্বা হাত দুখানায় এত জোর যে শত্রুকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে।

ওরাঙরা ভারী তাড়াতাড়ি গাছের ওপর বাসা তৈরী করতে পারে। কিন্তু খুব উঁচু ডালে তৈরী করে না। ঝড়-ঝাপটা না লাগে সে সব বিবেচনা করে একটু নিচু ডালে বাসা বেঁধে রাতের বেলা তার মধ্যে সকলে ঘুমোয়। আবার এক বাসা প্রতিদিন ব্যবহার করে না, নিত্য নতুন ঘর বাঁধে। সেই বাসা দেখ্‌তে অনেকটা পাখীর বাসার মতো।

এই ত গেল ওরাঙদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

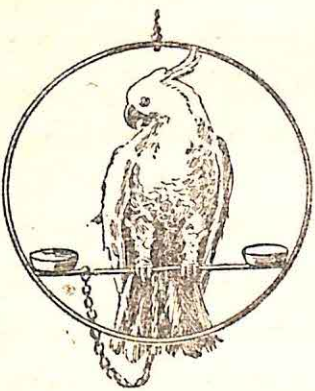
এবার যাদের কথা বল্‌ব, তাদের নাম তোরা প্রত্যহই শুনিস্‌। সেটা হচ্ছে—উল্লুক। এই প্রাণীটির বাস আসাম, ব্রহ্মদেশ ও যাভার জঙ্গলে।

এরা গাছে থাকে, ফল-মূল খায়; সকাল হলে পালে পালে সমস্বরে বন মাতিয়ে বানর-কণ্ঠে গান ধরে দেয়। সে শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যায়।

এদের আকার ছোট; দাঁড়ালে হাত দুখানা মাটিতে ঠেকে।

সেইজন্য উল্লুকেরা যখন সোজা হয়ে মাটিতে চলা-ফেরা করে তখন হাত দুখানা মাথার ওপর তুলে রাখে। 'সোজা হয়ে চলে' মানে মানুষের মতো স্বচ্ছন্দে নয়, ছোট ছেলেদের মতো টলে টলে।

উল্লুকেরা গাছের ডালে দোল খেতে বড় ভালবাসে। দোল খেতে খেতেই এগাছ থেকে ওগাছে চলে যায়। লাঙ্গুলহীন বানরদের মধ্যে এদের বংশ প্রাচীন।"



সপ্তদশ অধ্যায়

মানুষের আর বানরের পূর্ব্বপুরুষ

"ঐ চার শ্রেণীর বানরদের বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু বন্য অবস্থায় তার লক্ষণ বড় একটা দেখা যায় না। পোষ মানিয়ে কোন কিছু শেখালে এরা শেখে। এদের চরিত্রের আর একটা গুণ লক্ষ্য করবার এই আছে যে, এরা মানুষের বড় বাধ্য হয়, স্বভাবেও সলাঙ্গুল বানরের "বাঁদরামো" প্রকাশ পায় না।

মানুষের সঙ্গে ঐ চার জাতের লাঙ্গুলহীন বানরের, বিশেষ করে গরিলা আর শিম্পাঞ্জীরই কতকগুলো বিষয়ে বেশি মিল দেখা যায়।

ওদের হাত ও পায়ের সঙ্গে মানুষের হাত-পায়ের অনেক মিল আছে। আবার শিম্পাঞ্জীশিশু আর মানবশিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন তাদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে, দুটোকেই প্রায় একরকম দেখ্‌তে। অবশ্য গরিলা, ওরাঙ ও গিবনশিশুর সঙ্গেও মানবশিশুর মিল আছে, তবে শিম্পাঞ্জীশিশুর মতো অতটা নয়।

আবার দেখ্, মানবশিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন ওদের মাতৃগর্ভস্থ শিশুর মতো তারও সারা গা লোমে ঢাকা, জন্মাবার সময় ওদের কারো গায়েই সে সব লোম থাকে না—কেবল মাথায় চুল গজায়।

মানবশিশু ক্রমে বড় হয়; তার সারা গায়ে আর ঘন ও বড় লোম গজায় না, কিন্তু ঐ সব বানরশিশুর গা আবার দীর্ঘ ঘন লোমে ঢেকে যায়।

নানা দিক্ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, লাঙ্গুলহীন বানরদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীর সঙ্গেই মানুষের সম্বন্ধটা বড় নিকট।

এই সঙ্গে আর একটা প্রাণীর কথাও বলে রাখি। তাকে তোরা এর আগে দেখেছিস্। লেমুরের কথা মনে পড়ে কি?"

"হাঁ—হাঁ—।"

"মানুষের উৎপত্তি ঠিক যে কোথা থেকে তা বলা এখনও খুব কঠিন। তবুও তার সঙ্গে যে-সব প্রাণীর নানা বিষয়ে মিল দেখা যায় এবং মনে হয় ওদের মধ্যে মানুষের উৎপত্তির রহস্যটা লুক্কায়িত আছে, তাদের বিষয় একটু আলোচনা করা দরকার।

লেমুর মানে কি জানিস্? 'নিশাচর প্রেত।' এ নাম ওদের কেন হল?

প্রাণীগুলো বানর শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু বড় লাজুক, দিনের বেলা পেঁচার মতো অন্ধকারে গাছের ঘন ডালপালার মধ্যে বসে থাকে, সন্ধ্যা হলেই বার হয়। এরা গাছের ডালে ডালে থাকে, গাছের ডালে ডালেই পোকামাকড় খেয়ে বেড়ায়। এরা গাছেই চলাফেরা করে, তবে খাবার চেষ্টায় মাটিতেও নেমে আসে। সন্ধ্যা হলেই লেমুরেরা গাছের ডালে ডালে ও মাটিতে ঘুরে বেড়ায় বলে ওদের ওই নাম।

আমাদের দেশে, আসাম অঞ্চলে এক রকমের লেমুর আছে, তার নাম—লজ্জাবতী। তাদের চেহারা দেখলে মনে হয়, নামটা সার্থক। মাডাগাস্কারের বন্যেরা লেমুরদের পবিত্র-প্রাণী জ্ঞান করে কখনও মারে না। একথা শুনে তোরা হাসিস্ নি। কেননা, আমরা 'সভ্য' ভারতবাসীরাও কয়েকটা প্রাণীকে দেব-দেবীর বাহন বলে বড় খাতির করি।

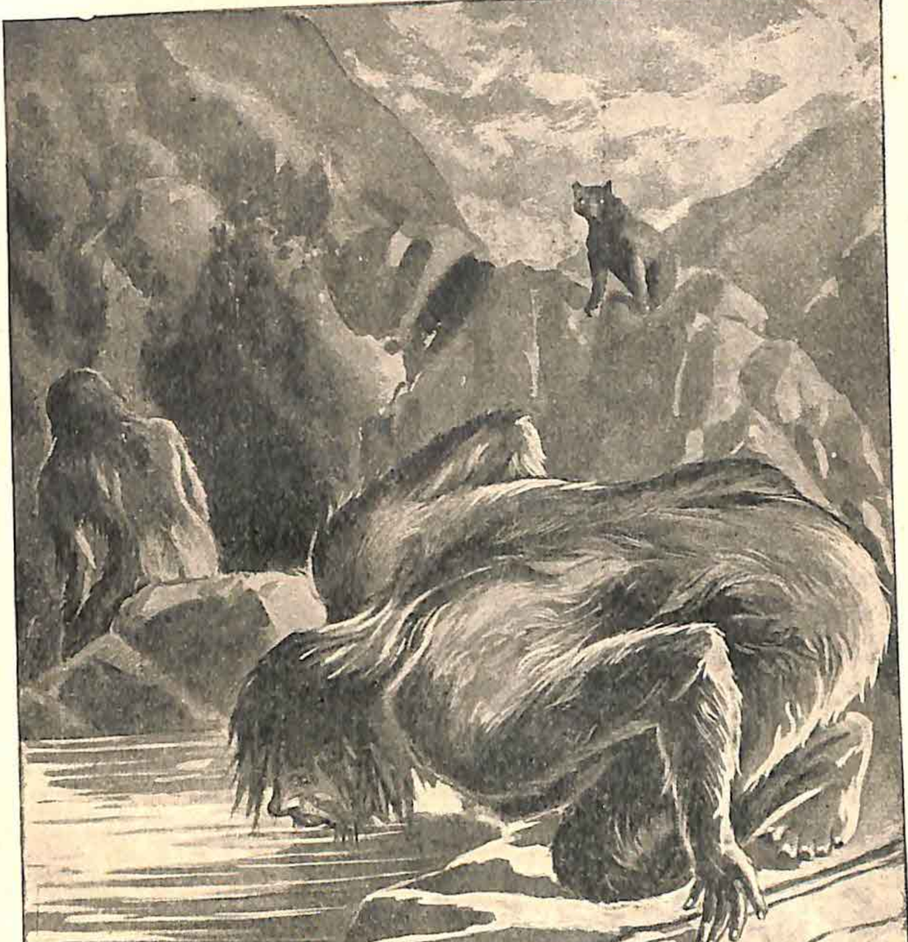
মাডাগাস্কারে ও ভারতে আসামের জঙ্গলে নানা রকমের লেমুর দেখা যায়।

পণ্ডিতদের ধারণা যে, লেমুরেরা বানরজাতির পূর্ব্বপুরুষ। লাঙ্গুল-হীন বানরও এদের মধ্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু কি করে, তা বলা বড় কঠিন।

কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর, বিশেষ করে ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি কয়েকটার জীবনের ধারা কোন্ যুগে কোন্ পথ ধরে চলেছিল, এর প্রমাণ যেমন পৃথিবীর নানা স্তরে সঞ্চিত রয়েছে, মানুষের জীবনের ইতিহাসের সম্পূর্ণ কাহিনী তেমন ভাবে কিন্তু কোথায়ও নেই। আবার একে-বারেই যে নেই, একথাও জোর করে বলা যায় কি করে? হয়তো কোন নদীগর্ভে, কোন গুহামধ্যে, কোন বননিম্নে, সমুদ্রের কোন এক নির্জ্জন তীরে এমনি কোথায়ও না কোথায়ও তা গুপ্ত আছে। আজ তার সন্ধান না পাওয়া গেলেও মানুষের অনুসন্ধিৎসার কাছে একদিন তা ধরা দেবেই।

একটা কথা তোরা সর্ব্বদা মনে রাখবি। যে-সব কঙ্কাল বা গাছ-পালা পাথরে পরিণত হয়েছে, সে সবই ছিল চাপা; না হলে, তার বেশির ভাগই হয়তো নষ্ট হয়ে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়ে যেত। একখানা কাঠকে কয়েক বছর বাইরে ফেলে রাখলে কি রকম হয় দেখেছিস্ তো।

সেইজন্য আদিমযুগের মানুষেরা কেমন ছিল, তাদের মুখের আকৃতি, শরীরের গড়ন সম্বন্ধে কতকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাদের চোয়াল, দাঁত, মাথার খুলি যা প্রস্তরীভূত অবস্থায় পৃথিবীর এদিকে-ওদিকে দৈবাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তারা যে-সব অস্ত্রশস্ত্র



ওখান থেকেই উপুড় হয়ে পড়ে চুমুক দিয়ে জল খাচ্ছে

ব্যবহার করত, যেখানে বাস করেছিল, যা আহার করত, তার নিদর্শন নানা জায়গায় রেখে গেছে, আমরা সেগুলো দেখে তাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পারছি।

মানুষ ও মানুষের মতোই এক রকম প্রাণীর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, যাদের আমরা মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলে অনুমান করছি, তারা কিন্তু গাছে উঠ্‌তে তেমন পটু ছিল না। এদের যারা পূর্ব্বপুরুষ তারাই ছিল শাখাবাসী। এরা বেশির ভাগ সময়ই থাক্‌ত মাটিতে, কখন কখন খাদ্য সংগ্রহের জন্য গাছে উঠ্‌ত ; বিপদ্-আপদের সময় গাছের শাখায় বা ঐ রকম কোন নিরাপদ্ বা গোপন জায়গায় আশ্রয় নিত। এদের আর একটা শক্তি ছিল, পায়ের আঙ্গুল দিয়ে ফল, ফুল, ডাল-পালা চেপে ধরা।

আমাদের এই সভ্য যুগেও বিশেষ সভ্য একটি জাতি আজও তা পারে—তারা জাপানী।

তোরা ভাবছিস্ হয়তো এই রকম প্রাণীতে সে যুগের বন ভরা ছিল ; তারা দলে দলে এক একটা বনে বসবাস করত। আবার দলে দলে বন থেকে বনান্তরে চলে যেত। তা নয়। আজকাল যেমন শিম্পাঞ্জী, গরিলা, গিবন ও ওরাঙ্ওটানের সংখ্যা পৃথিবীতে বেশি নেই, গভীর বনের কোথাও কোথাও দুটি একটি পরিবারকে বা দু একটিকে দেখা যায়, সেই যুগের ঐ বানরজাতীয় প্রাণীগুলোও তেমনি বনের এখানে, ওখানে, সেখানে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে দুটি একটি করে বাস করত। এ-যুগের ঐ লাঙ্গুলহীন বানরের মতো তারাও খাদ্যান্বেষণে সপরিবারে বা একাকী গভীর বনে বনে ঘুরে বেড়াত।

তবে এই লাঙ্গুলহীন বানরদের সংখ্যা কম হলেও নিতান্ত নগণ্য নয়।

তাদের মনে খাদ্য, আশ্রয় ও সন্তান পালন ছাড়া আর কোন চিন্তাই উঠ্‌ত না। এই তিনটির উপায় হলেই তারা খুশী হত।

কিন্তু কোন যুগেই এই তিনটির সংস্থান সকলের পক্ষে সহজ ছিল না। এগুলি সংস্থানের পথে ছিল নানা বাধা। তারা সে বাধা দূর করে' অতি সাবধানে জীবনের অতি কঠিন পথ পার হয়ে চলেছিল।"

একটি নাতি জিজ্ঞাসা করলে—"ঠাকুরদা, মানুষের পূর্ব্বপুরুষেরা মানুষের আকার ধারণ করবার আগে ঠিক কি রকমের ছিল? তার মস্তিষ্কের পরিমাণ কি বরাবরই ছিল বেশি?"

"না। এটা অবশ্য অনুমানের কথা। সব দিক্ বিচার করে' পণ্ডিতেরা বলেন, তাদের সারা গা ছিল লাল বা কালো লোমে ঢাকা। হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো ছিল লম্বা। পা দুখানা বাঁকা ও ছোট এবং পায়ের পাতার নিচেটা ছিল বাঁকা। এতে তাদের পা দিয়ে ডালপালা চেপে ধরবার বড় সুবিধা হত। বানরেরাও তো পা দিয়ে ডালপালা চেপে ধরে।

ক্রমে তাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল; তার ফলে তাদের বুদ্ধি বাড়ল এবং নানাদিকে উন্নতি দেখা দিল।

তারা শাখা ত্যাগ করে মাটিতে বাস করতে আরম্ভ করলে। তার ফলে তাদের হাত, পা ও দেহের আকার বদলে গেল। আকারেরও পরিবর্ত্তন ঘটল। দাঁত ও নখের পরিবর্ত্তে এখন তারা অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে আত্মরক্ষা করে।

গাছের চেয়ে মাটিতে বিপদ্ বেশি। নানা রকমের হিংস্র প্রাণীতে ছিল বন ভরা। অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে তারা আত্মরক্ষা তো করতই তার ওপর বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার বড় উপায় স্বজাতি-প্রীতি ও

দলবদ্ধ ভাবে বাস, সে ইচ্ছাও ক্রমে তাদের মনে জেগে উঠ্‌ল! এই ভাবে মানুষের মধ্যে ধীরে সামাজিক জীবনের সূত্রপাত হল।

তাদের ভাষাও সম্ভবতঃ এই সময়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। আগের চেয়ে এখন তাদের প্রয়োজন বেশি, জিনিষও অনেক। আগে তাদের দাঁত ও নখ ছিল অস্ত্রস্বরূপ। সেইজন্য ওগুলো ছিল বড়। কিন্তু এখন অস্ত্র-শস্ত্র তার জায়গা অধিকার করলে। সেইজন্যে নখগুলো ছোট হয়ে গেল, মুখেরও পরিবর্ত্তন হল। কথা বলবার মতো মুখে মাংসপেশী একটু একটু করে গঠিত হতে লাগল।”



অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রাচীন মানব জাতি

"কিন্তু কোথায় যে প্রথম মানুষটি প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে এখন ঠিক করে কিছু বলা সম্ভব নয়। আর কি ভাষা যে তার কণ্ঠে জেগেছিল তাই বা কে বল্‌বে? পৃথিবীর আদি মানুষের সঙ্গে সে ভাষাও হয়তো পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। অথবা মানুষের দেহে ও স্বভাবে এতকালেও যখন তার পূর্ব্বপুরুষের ছাপ সম্পূর্ণ মুছ্‌ল না, বরং তার অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তেমনি তার ভাষা-স্রোতের কোথাও না কোথাও দুটি একটি নগণ্য ঢেউয়ের মতো সেই আদিকালের দুটি একটি কথা আজও হয়তো জেগে আছে; আমরা তা চিনতে পারছি না।

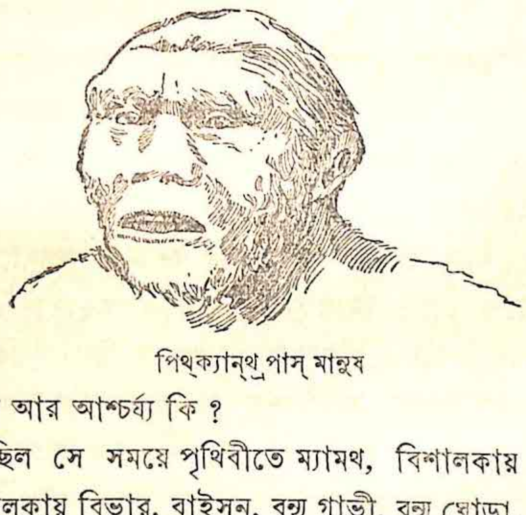
আমার কথা শুনে আদিমতম মানুষের ওপর তোদের নিশ্চয়ই মায়া পড়ছে? ভাব্‌ছিস্‌, এ সময় তাদের কারুকে পেলে আদর করে নানা রকম খাদ্যে পরিতৃপ্ত করতিস্‌; তারপর সকলে মিলে তাকে ঘিরে ধরে সেই আদিম যুগের বন-প্রান্তরের গল্প, তাদের জীবনের কাহিনী শুনতে আরম্ভ করতিস্‌।

কিন্তু আমি জোর করে বল্‌তে পারি, যদি অতীতের দুস্তর কাল-সাগর পার হয়ে তাদের কারোর আজ এখানে আসা সম্ভব হত, তাহলে তাকে ডাকা তো দূরের কথা, তাকে দেখেই তোরা কে কোথা পালাতিস্‌ তার ঠিকই থাক্‌ত না। সে মানুষের চেহারা ছিল যেমন ভীষণ, স্বভাবও ছিল তেমনি ভয়ঙ্কর। সে না ছিল মানুষ, না ছিল বানর;—ছিল এ দুইয়ের মাঝামাঝি এক লোমশ প্রাণী বিশেষ। বরং

তাকে লাঙ্গুলহীন ভূচর বানর বলাই ঠিক। তার নাম দেওয়া হয়েছে পিথ্‌ক্যান্‌থ্রপাস্‌।

পিথ্‌ক্যান্‌থ্রপাস্‌দের আর একটি নাম আছে—এপ-ম্যান।

এমন হলেও এরা যে আত্মরক্ষা বা শিকারের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করত, তাতে আর ভুল নেই। অবশ্য সে-সব অস্ত্র ছিল পাথরের। এখনও তো দেখা যায় গিবন-বানর পাথর দিয়ে বাদাম ভেঙে খায়। এরা এই সব বানরের চেয়ে বেশ কিছু উন্নত ছিল; কাজেই অস্ত্র-শস্ত্র যে ব্যবহার করত, এতে আর আশ্চর্য্য কি?



পিথ্‌ক্যান্‌থ্রপাস্‌ মানুষ

এরা যে সময়ে ছিল সে সময়ে পৃথিবীতে ম্যামথ, বিশালকায় গণ্ডার, জলহস্তী, বিশালকায় বিভার, বাইসন, বন্য গাভী, বন্য ঘোড়া, খড়গদন্তী বাঘ ছিল প্রচুর। কিন্তু তখনও সিংহ ও আজকালকার বাঘ দেখা দেয় নি।

এই প্রাণীদের মাঝে তারা অতি সাবধানে বিচরণ করত এবং সুযোগমত এদেরই শিকার করে হাড়, মাংস, মজ্জা খেত। আবার সব সময় যে শিকার করা সম্ভব হত তা' নয়, যদি দেখ্‌ত কোন বাঘ কোন পশুকে বধ করেছে, তাহলে শিয়ালের মত বাঘকে ফাঁকি দিয়ে এরা সেই নিহত পশুর মাংসই খেত।

এদের সমসাময়িক যাভা ও চীনেও দুই শ্রেণীর এপ-ম্যান ছিল। এদের পর আবার যে মানুষেরা ও প্রাণী পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল, তাদের আকার ও স্বভাব এদের চেয়ে একটুও ভদ্র ছিল বলে তো মনে হয় না।

পিথ্‌ক্যান্‌থ্রপাস্‌দের পর পৃথিবীতে যে মানব-জাতি দেখা দিয়েছিল, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে হিডেলবার্গ মানুষ। জারমানির হিডেলবার্গে এদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গেছে বলে এই নাম।

এরা ছিল যেমন লম্বা, তেমনি ছিল চওড়া ; সারাগায়ে ছিল বড় ঘন লোম। মুখখানা মস্ত ও কদাকার। এক একটা মানুষ ছিল এক একটা অসুর বিশেষ।

এরা যে-সব অস্ত্র ব্যবহার করত, তা আমাদের একালের মানুষের পক্ষে হাতে নিয়ে বেড়ানো একরকম দুঃসাধ্য। সে-সব অস্ত্র ওজনে বেশ ভারী ও আকারেও খুব বড় ছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার এই চোখে পড়ে যে, পশু-সমান হলেও অস্ত্র-নির্ম্মাণের কাজে এরা ছিল পূর্ব্বযুগের অস্ত্রধারীদের চেয়ে অনেক উন্নত। এতে মনে হয়, তারা একটু চিন্তা করত। যখন চিন্তাশক্তি একটু বেড়েছিল, তখন নিশ্চয়ই তাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ ছিল ওদের চেয়ে বেশি।

এরা যখন ছিল তখন পূর্ব্বযুগের প্রায় সব রকমের প্রাণীই পৃথিবীতে বিচরণ করছে। কেবল খড়গদন্তী বাঘকে বড় একটা দেখা যায় না, তার জায়গায় বনে বনে সিংহ দেখা দিয়েছে। কিছুকালের মধ্যেই খড়গদন্তী বাঘ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হিডেলবার্গ মানুষদের প্রধান খাদ্য ছিল, মাংস। তখন ছোট-বড় নানা রকমের প্রাণীতে পৃথিবীর বন ছিল ভরা। এরা শিকারের

সন্ধানে পাথরের অস্ত্র হাতে বনে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে-পর্ব্বতে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু বাড়ী তৈরী করতে জানত না।

এদের বাসস্থান ছিল, সম্ভবতঃ বন ও জলার ধার। জল ছাড়া প্রাণী বাঁচে না ; নদী, হ্রদ প্রভৃতির ধারে এখনও তো বড় বড় শহর ও নগর দেখা যায়।



পিল্‌ট্‌ডাউন

এরা গাছতলায় বা খোলা জায়গায় জলার ধারে ও পাহাড়ের কোলে বসবাস করত। ঝড়-বৃষ্টির সময় ছুটে গিয়ে কোন এক নিরাপদ্ জায়গায় আশ্রয় নিত।

চারধারে হিংস্র বন্য-জন্তুর উৎপাত ; রাত্রে বিপদের ভয় আরও বেশি। কি উপায়ে যে এরা আত্মরক্ষা করত, সন্তান-সন্ততিদের নিরাপদে রাখত—এটা অবশ্য ভাববার বিষয়। যতদূর মনে হয়, এরা আগুন জ্বালাতে জানত না।

তোরা ভাব্‌ছিস্, এই সব মানুষগুলো স্বভাবে ও আকৃতিতে পশুবিশেষ হলেও নিজেদের মধ্যে কখনও মারামারি করত না, বেশ মিলেমিশে থাকত।

বরং এই সভ্য যুগের মানুষদের আচরণ লক্ষ্য করলে বুঝ্তে পারবি খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি নিয়ে তাদের মধ্যেও কখন কখন তুমুল ঝগড়া বাধত। তবে সে ঝগড়াটা এই সভ্য যুগের মতো মহা-যুদ্ধের আকার ধারণ করে' সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ত না।

রাগের বা ঝগড়ার সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ বলে এরা কারুকে খাতির বা সমীহ করত না ; শত্রু যখন, তখন তাকে হত্যা করতেই হবে। হয়তো সেই পাথরের বল্লম দিয়ে কারুকে বিদ্ধ করলে বা কুঠারের আঘাতে মাথা দুখানা করে ফেল্‌লে, অথবা তাকে আছড়ে মেরে ফেল্‌লে। আবার ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধও বেধে যেত—কাম্‌ড়ে, আঁচড়ে প্রতিদ্বন্দ্বীরা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করে দিত। আমাদের এই অতি সভ্য যুগে, অতি সভ্যদের মধ্যেও সেই পাশবিক আচরণ আজও দেখি না কি ?

হিডেলবার্গ মানুষগুলো খুবই বল-বিক্রমশালী ছিল ; কিন্তু এরাও একদিন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এদের পরিত্যক্ত অস্ত্র-শস্ত্র দেখেই এদের বিষয় আমরা আজ যা কিছু অনুমান করতে পারছি।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, হিডেলবার্গ মানুষেরা পৃথিবীতে পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে ছিল।

এদের পর দেখা দিল পিল্‌টডাউন মানুষ। এরাও ছিল ওদেরই মতো বন্য, হিংস্র, কদাকার ও শক্তিশালী। তবে এরা যে-সব অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করত সেগুলো ছিল ওদের চেয়েও কিছু উন্নত ধরণের। এরাও অতি দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাক্‌ল না, কালস্রোতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল।”

ঊনবিংশ অধ্যায়

হিমযুগের শেষ—নূতন মানব জাতি

“মাত্র হাজার পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা—

তখনও হিমযুগ শেষ হয়নি, পৃথিবীর উত্তর ভাগের জায়গায় জায়গায় বরফ জমা হয়ে আছে; হাতী, ম্যামথ, জলহস্তী, বল্‌গা হরিণ, সিংহ, বাইসন, কস্তুরীগাই প্রভৃতি প্রাণী বনে বনে বিচরণ করছে, কিন্তু পিল্‌ট্‌ডাউন মানুষ অনেক কমে এসেছে; এমনি সময় এক শ্রেণীর নতুন মানুষ পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল।

এদের নাম নেন্‌ডারথেল মানুষ!

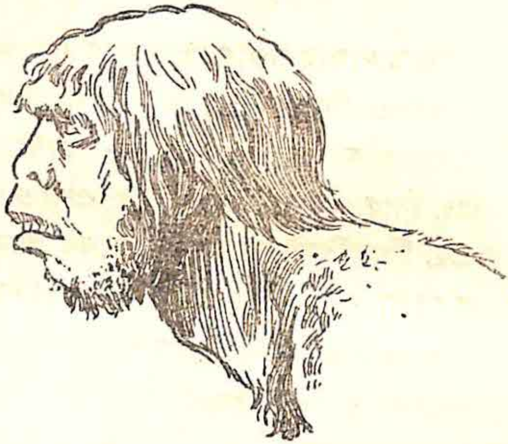
আকৃতির সঙ্গে তুলনা করে মানুষের সমশ্রেণীতে এদের স্থান দেওয়া যেতে পারে।

সমশ্রেণীর হলেও এরা কিন্তু মানুষের মতো সোজা হয়ে চল্‌তে পারত না, আগের মনুষ্যাকৃতি বানরজাতীয় পশুগুলোর মতোই সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়াত বা চল্‌ত। এদের বুড়ো আঙ্গুল ছিল আড়ষ্ট, মুখের চেহারা কদাকার, গায়ে বড় বড় লোম, পেশীগুলো পরিপুষ্ট, আকৃতি দীর্ঘ। গায়ের রঙ কেমন ছিল, তা বলা কঠিন। তবে এদের মুখের সঙ্গে হিডেলবার্গ মানুষদের মুখের অনেকটা মিল অনুমান করা যায়, যদিও এরা তাদের বহু সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীতে এসেছিল।

এদের বহু আগে যে-সব হিডেলবার্গ মানুষ ছিল এবং এদের

সময়েও যে পিল্‌ট্‌ডাউন মানুষগুলো অবশিষ্ট ছিল, তারা বনে বনে, প্রান্তরে প্রান্তরে, জলাশয়-তীরে খাদ্যান্বেষণে ঘুরে বেড়াত ; সুবিধা হলে ঐ-সব জায়গায়ই বসবাস করত। এরা আগুন জ্বালাতে জান্‌ত।

এরা যখন ছিল, প্রথম দিকে তখন তেমন প্রখর শীত ছিল না। তাই ওদের মত এরাও খোলা জায়গায় জলাশয়ের ধারে বসবাস কর্‌তে আরম্ভ করেছিল। সন্ধ্যা হলেই এদের আস্তানায় আস্তানায় আগুন জ্বলে উঠত। তারি পাশে এরা সন্তান-সন্ততি নিয়ে রাত কাটাত। তখনকার



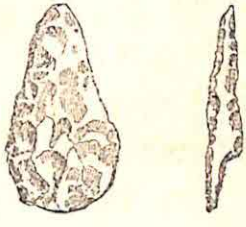
নেন্‌ডারথেল

একটি দৃশ্য এই ভাবে কল্পনা করা যেতে পারে ঃ চারধারে বন্য পশু ডাক্‌ছে ; কোন পশু লোভে লোভে এদের কাছেও আস্‌ছে, কিন্তু আগুনের ভয়ে আবার দূরে সরে যাচ্ছে। পশু দেখেই এরাও আগুনটা উস্কে দিচ্ছে—ঐ তার ফুল্‌কি উড়ছে, ওদের মুখে-চোখে তার আভা। মানুষগুলোর হাতে অস্ত্র ; চোখে হিংসা, সতর্কতায় শরীরের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে।

কিছুকাল পরে আবার হিমের প্রকোপ প্রখর হল। তখন তো আর খোলা জায়গায় থাকা সম্ভব নয়। একে দারুণ শীত ; তার ওপর

শরীরে বিশেষ কোন আচ্ছাদন নেই। তারা পাহাড়-পর্ব্বতের গুহায় অথবা পর্ব্বতের আলসের নিচে বা কোন আবৃত স্থানে হিম থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিতে বাধ্য হল।

তখনও পিল্‌ট্‌ডাউন মানুষ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। কিন্তু এই দারুণ দুর্দ্দিনে তারা অন্তর্হিত হয়ে গেল; কেবল নিদর্শন থাক্‌ল তাদের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্র-শস্ত্রে।


পাথরের অস্ত্র

তাদেরই মতো নেন্‌ডারথেল মানুষের অস্ত্র-শস্ত্র ছিল পাথরের। কেবল পাথরের কেন? যারা আগুন জ্বাল্‌তে জান্‌ত, তারা নিশ্চয়ই কাঠের অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর কৌশলও বার করেছিল।

তবে সে-সব অস্ত্র আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, নষ্ট হয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শীত যখন প্রখর হল, তখন কেবল তারাই যে পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, তা নয়। সিংহ, ভালুক, হায়েনা প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরাও শীতের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পর্ব্বত-গহ্বরে, কন্দরে আশ্রয় নিতে লাগল। শীতের দরুণ পৃথিবীর বনপ্রান্তরেরও কিছু পরিবর্ত্তন হল।

ফলে বাসস্থান নিয়ে পশু ও পশুপ্রায় মানুষের মধ্যে ভীষণ মারামারি বাধল। ব্যাপারটা যে দু'পক্ষেরই জীবন-মরণের।

সেই দারুণ শীতে রাত্রিকালে খোলা জায়গায় থাকা মানেই মৃত্যু। কিন্তু মানুষের সঙ্গে পশু পারবে কেন। তারা আগুন জ্বেলে ও অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে পশুদের গুহা থেকে তাড়িয়ে দেয়। রাত্রে বন্য জন্তুর ভয়ে গুহামুখে আগুন জ্বেলে বা পাথর চাপা দিয়ে রাখে। বাইরে

তুষার পড়ছে, কি প্রবল তুষার-ঝড় বইছে, সিংহ, ভাল্লুক আশ্রয় খুঁজে গুহামুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মানুষগুলোর তাতে ভয় নেই। তারা গুহা-মুখ বন্ধ করে' নিরাপদে রাত্রিযাপন করছে।



পাথরের অস্ত্র

গুহায় আশ্রয় নিলেও তারা কিন্তু গুহার খুব বেশি দূরে যায় না। প্রায় মুখের কাছেই সন্তান-সন্ততি নিয়ে বসবাস করে; তারই একপাশে কাঠ-কুটো, খাদ্য, চকমকি পাথর, অস্ত্র-শস্ত্র জমা করে এবং দরকার হলে সেইখানেই দু'একটি পশু বেঁধে রাখে।

তারা পোষাক পরত। তা অবশ্য লজ্জা নিবারণ বা সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য। তবে সে পোষাক ছিল পশুচর্ম্মের। অন্ধকার দূর করবার জন্য তাদের আলো ছিল মশাল। রাত্রে গুহামধ্যে মশাল হাতেই এরা চলা-ফেরা করত।



পাথরের অস্ত্র

আবার সকাল হলেই তারা বার হ'ত শিকারের সন্ধানে বনে, প্রান্তরে, জলাশয়ের ধারে; হাতে হাড় বা কাঠের বল্লম, কাঠের বড় বড় মোটা লাঠি, পাথরের ধারালো ঢিল।

মাংসই তাদের প্রিয় খাদ্য; কিন্তু তা সংগ্রহ করাও সহজ নয়। ঐ সব অস্ত্র দিয়েই তারা ক্বচিৎ ম্যামথ, ভাল্লুক, বল্‌গা হরিণ শিকার করে। এতে বিপদ্ যথেষ্ট; সব সময় সাফল্যও লাভ করা যায় না।

মাংস প্রিয় খাদ্য হলেও নানা রকম বন্য ফল, মূল, ফুল, পাতা, ব্যাঙের ছাতাও তারা খায়। এই সবের সন্ধানে সারাদিন চারধারে ঘুরে বেড়ায়।

খাদ্যান্বেষণ করতে করতে কখনও কখনও আস্তানা থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। বসবাসের সুবিধা হলে আর ফিরে আসে না, সেইখানেই এই নতুন আস্তানা পাতে।

চলার পথে অনেক সময় বড় বড় প্রাণী আপনিই ভাগ্যে জুটে যায়। হয়তো গভীর গর্তে বা বরফের কাদায় কোন ম্যামথ হঠাৎ পড়ে গেছে, কত চেষ্টা করেও উঠতে পারছে না, তখন তাকে আট-দশজন মিলে বল্লম দিয়ে মেরে ফেলে। আবার হয়তো কোথাও দুটো ভাল্লুকে বা হরিণে লড়াই করছে ; একটা পরাস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ল, তারা সেই সুযোগে তাকে শিকার করলে। আবার কোন ম্যামথ হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তারা তার পিছনে পিছনে চল্‌তে লাগল ; শেষে যেখানে গিয়ে সেটা মারা গেল, সেখানেই সেটাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে বিরাট ভোজ লাগিয়ে দিলে।

সাধারণতঃ তাদের শিকার ছিল ছোট ছোট প্রাণী। কিন্তু ছোট-বড় যে-কোন প্রাণীই হোক, শিকার করে তার মৃতদেহ তারা আস্তানায় নিয়ে আসে না ; শিকারের জায়গায়ই তার মাংস খেয়ে হাড়গুলো নিয়ে আস্তানায় ফেরে, তারপর সময়মতো সেগুলো ভেঙ্গে তার ভেতর থেকে মজ্জা বার করে মহানন্দে খায়।”

বিংশ অধ্যায়

প্রাচীন মানুষের ঘর-কন্না

ঠাকুরদা বলে যাচ্ছেন—"সামনে নদী ; ওপারে খড়িপাথরের বনাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা। ঐ যে নদীতীরে একদল নেন্‌ডারথেল মানুষের আস্তানা পড়েছে। জায়গাটা আস্তানা পাতবার পক্ষে উপযোগী বটে। সামনে জল ; তৃষ্ণার সময় যে জলের দরকার। পিছনে বিশেষ এক রকমের পাহাড় ; অস্ত্র-শস্ত্র গড়তে ঐ রকম পাথরই চাই।

পুরুষেরা শুক্‌নো ডাল-পালা বিছিয়ে তার ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছে ; পাশে হাড়, কাঠ ও পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র। ছোট ছোট শিশু ও মেয়েরা বন থেকে শুক্‌নো কাঠ-কুটো এনে জড় করছে। ওগুলো দিয়ে আগুন জ্বাল্‌বে। এই শীতে আগুন না হলে চলে ? আবার রাত্রে এমন জায়গায় আগুনই বন্য পশুদের তাড়াবার একমাত্র অস্ত্র।

ঐ যে একদিকে ডাল-পালার ছাপ্পড়ের মতো দেখা যাচ্ছে। ঐ দিক থেকে হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আস্‌ছে। বোধ হয় বাতাসকে আড়াল করবার জন্যে ছাপ্পড়টা তৈরী করেছে।

সকলেই চুপ-চাপ ; বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা কারো মুখে নেই। না থাকবারই কথা। এদের শব্দ-সংখ্যা সামান্য। দুটি একটি শব্দে এরা মনের ভাব প্রকাশ করে।

তিনজন নেন্‌ডারথেল পুরুষ ও দুটি শিশু নদীর তীর দিয়ে

লের কিনারে এল। কিন্তু কেউ জলে নামল না। থেকেই উপুড় হয়ে পড়ে চুমুক দিয়ে জল খাচ্ছে। রকম দেখে চ্ছে, এরা কোনদিনও জলে নামে না! আর তৃষ্ণা পেলে ঠিক এই রকম করেই জল খায়। কোন রকমের পাত্র গড়তে জানে না তো, জল তুল্‌বে কি দিয়ে?

ঐ মেয়েগুলো কোথায় যাচ্ছে? পাহাড়ের দিকে? চল্ ওদের সঙ্গে যাই।

ঐ যে কয়েকটা ছেলেও ছুট্‌তে ছুট্‌তে এধারে আস্‌ছে। পাহাড়টা কাছেই; তার তলায় এসে মেয়ে ও ছেলেগুলো চারধারে কি যেন খুঁজছে! লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখছে, পা দিয়ে সরাচ্ছে—হাত দিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরছে। ওরা বোধ হয় পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঐ পাথর দিয়ে অস্ত্র তৈরী হবে। যে সে পাথর দিয়ে তো অস্ত্র তৈরী হয় না; তার জন্য শক্ত পাথর দরকার। তাই বেছে বেছে নিচ্ছে। কিন্তু এদের কারিকর কে?

এদিকে বেলা পড়ে আস্‌ছে। সকলে আস্তানায় ফিরে চল্‌ল।

আস্তানায় খাওয়া শুরু হয়েছে—পচা মাংস, নানা রকমের বুনো ফলমূল। তার মধ্যে আমরা অনেক জিনিষই চিনি—চীনে বাদাম, ট্যাঁপারী, ব্যাঙের ছাতা, পাখীর ডিম, পাখীর বাচ্চা, মধু, মৌচাক, কচি পাতা, পিয়ারা, ব্যাঙ, শামুক, নিউট, মাকড়সা। ঐ যে মাছও আছে দেখ্‌ছি।

খাওয়া শুরু হল।

চারধারে মাছি ভন্ ভন্ করছে; মাংসে পিঁপড়ে ধরেছে। তাতে কি? পিঁপড়ে বেছে বেছে মাংস খাচ্ছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে,

পচা মাংস এদের ভালই লাগে। আমাদের এই সুসভ্য ... শামুক, পচা মাংস, মাকড়সা অনেক সভ্য জাতি তারিফ ... তাদের নাম আর করব না।

সকলেই খাচ্ছে! পাথরের ওপর হাড় রেখে পাথর দিয়ে ভেঙে মজ্জা বের করছে।

ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল; দূরে সিংহ গর্জ্জন করছে। পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি হচ্ছে। শীতটা যেন চেপে এল। একজন শুক্‌নো পাতা জড় করে তার মধ্যে চক্‌মকি পাথর রেখে আরেকটা পাথর দিয়ে ঠুকে আগুন জ্বাল্‌লে। অমনি চারধার থেকে সকলে আগুনের ওপর শুক্‌নো পাতা, সরু ডাল ফেলে দিচ্ছে, আগুনটা যাতে নিভে না যায়। যে ঠাণ্ডা বাতাস, আগুন একবার নিভলে, সহজে জ্বালানো যাবে না।

এবার দাউ দাউ করে' আগুন জ্বলে উঠল। শীত-সন্ধ্যার ম্লান আকাশে তা থেকে কাল ধোঁয়া উঠছে। দেখে মনে হচ্ছে, আগুনকে এরা বেশ যেন শ্রদ্ধা করে। এমন বন্য জীবনে এত বড় সহায় আর কি আছে?

ছেলে—মেয়ে—পুরুষ—বুড়ো সকলে ঘেঁষাঘেঁষি করে' আগুনের চারধারে বস্‌ল। কিন্তু খাওয়া এখনও বোধহয় হয় নি। ঐ যে খাচ্ছে।

দলের মধ্যে একজন বুড়ো আছেন। উনি বোধহয় সর্দ্দার। সেই তখনকার পাথরগুলো ওঁর সামনে জড় করা রয়েছে। উনিই ঐ পাথর দিয়ে অস্ত্র তৈরী করবেন। ওঁকে সকলে সাহায্য করবে ও ওঁর কাছ থেকে অস্ত্র তৈরী করা শিখ্‌বে।



ইগুয়ানোডনটা বনের ধারে কাঙারুর মত বসে ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে-ওদিকে কি যেন দেখ্‌ছে।